ইসলামী ব্যাংকিং

ডিসেম্বর ২০১৪

ইসলামী ব্যাংক

বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

Islami Banking

December 2014
A Journal
Published by Public Relations Division
Islami Bank Bangladesh Limited

জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক
প্রধান কার্যালয় : ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার
৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ডিজাইন : নাহিদ প্রিন্টিং এ্যান্ড ডিজাইন স্টুডিও
মুদ্রণ :

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫

মনজের কাহ্‌ফ
ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা ৭

মুহাম্মদ ইরফান
ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়নের প্রসারে শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের ভূমিকা ৩৩

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং : সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে ৪৯

ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান
ইসলামী অর্থায়নের বিশ্বায়ন : কল্পনা না বাস্তব ৭১

ড. নিসার আহমদ
ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা : ব্যবসায়িক ঝুঁকিতে অংশীদারিত্ব ৯২

মোহাম্মদ বশির শেঙ্গুয়েল
ইসলামী ব্যাংকিং ও সর্বশেষ আর্থিক সঙ্কট ১০৪

মাইকেল বাসলার
আর্থিক সঙ্কট : পশ্চিমা বনাম ইসলামী ব্যাংকিং ১১৫

সম্পাদকীয়

প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থায়ন ব্যবস্থার বিপরীতে লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বভিত্তিক ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বড় ঘটনা। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে এমন প্রায় প্রতিটি দেশে কোনো-না-কোনোভাবে ইসলামী অর্থায়নের বিস্তার ঘটেছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের পর ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি আরো জোরালোভাবে অনুভূত হয়। লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট, টোকিও এবং টরন্টোর মতো প্রচলিত অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রগুলোতেও ইসলামী অর্থায়নের উপস্থিতি জোরদার হচ্ছে।

ইসলামী নবজাগরণের ফলস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শুরু হয় ইসলামী ব্যাংকিং। এ সময় ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক আন্দোলনে যুক্ত হয় দুটি পরস্পর সম্পর্কিত ঘটনা : নতুন ব্যাংকিং কৌশল উদ্ভাবন এবং ওলামা ও ব্যাংকারদের মধ্যে একটি জোট। ইসলামী ব্যাংকিং-এর উদ্ভাবিত কৌশলগুলো ছিল এ জোটের শ্রমের ফসল। ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি প্রভাবিত করে এ জোট। ওলামা এবং ব্যাংকারদের মধ্যে এ জোট গড়ে ওঠার কৌশলগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন ড. মনজের কাহ্ফ তাঁর 'ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা' শীর্ষক নিবন্ধে। ইসলামী ব্যাংকিং পেশার ভবিষ্যৎ প্রবণতার ওপর আলোকপাত করেছেন তিনি।

ইসলামী আইনশাস্ত্রের আলোকে পরিচালিত ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আলেমসমাজ। প্রাতিষ্ঠানিক পরিভাষায় যাদের শরী'আহ্ উপদেষ্টা বলা হয়। ইসলামী অর্থায়ন ও শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের মধ্যে সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করেছেন মুহাম্মদ ইরফান তাঁর 'ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়নের প্রসারে শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে। লেখক ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার উন্নয়নে শরী'আহ্ এবং আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ জনবল সৃষ্টির ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা কিভাবে এই ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন তাও দেখিয়েছেন তিনি।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংকিং বার্ষিক গড়ে আঠারো শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে নিজের সামর্থ্য ও দক্ষতা প্রমাণ করছে। মাত্র তিন দশক আগে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করা ইসলামী ব্যাংকিং বর্তমানে দেশের সার্বিক ব্যাংকিং শিল্পের এক পঞ্চমাংশ ধারণ করছে। সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। 'বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং : সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে' শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রযাত্রা, এর বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা করেছেন।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রযাত্রার পরও নতুন এই ব্যবস্থা আসলেই বিশ্বায়নের পথে কতটা অগ্রসর হয়েছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 'ইসলামী অর্থায়নের বিশ্বায়ন : কল্পনা না বাস্তব' শীর্ষক নিবন্ধে

এই প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন ফ্রেডারিক ভি পেরি এবং শেহেরাজাদে এস. রেহমান। নিবন্ধে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উত্থান সম্পর্কিত ইস্যু এবং বৈশ্বিক ব্যবস্থায় একীভূত হওয়া ও প্রবৃদ্ধির পথে বাধাসহ ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যবসায় চক্রের বিভিন্নপর্যায়ে সৃষ্ট ঝুঁকি প্রশমনে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা অধিক নিরাপত্তা দেয় এবং ব্যর্থতার আশঙ্কা কমিয়ে আনে। এটি ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের অন্যতম কারণ। এরপরও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা পুরোপুরি সুদমুক্ত নয় বলে কিছু মানুষ সন্দিহান। ড. নিসার আহমদ তাঁর 'ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা : ব্যবসায়িক ঝুঁকিতে অংশীদারিত্ব' শীর্ষক নিবন্ধে এ সংশয় নিরসনের চেষ্টা করেছেন। তার মতে, শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গ্রহণই সবচেয়ে ভালো সমাধান।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক আর্থিক সঙ্কটের কারণে লেহ্ম্যান ব্রার্দাস-এর মত বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর পতন হয়েছে। এর মধ্যেও বিশ্বব্যাপী ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল তুলনামূলক নিরাপদ। মোহাম্মদ বশির শেঙ্গুয়েল তাঁর 'ইসলামী ব্যাংকিং ও সর্বশেষ আর্থিক সঙ্কট' শীর্ষক নিবন্ধে দেখিয়েছেন, এই সঙ্কট আসলে ইসলামী আর্থিক শিল্পের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। ইসলামী ব্যবস্থাকে একটি বৈশ্বিক অর্থায়নকারী এবং সঠিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরার এখনই সময়।

পশ্চিমা অর্থায়ন বাজারে সৃষ্ট সঙ্কটের কারণে প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীরা বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হন। ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির অনুসারীরা ছিলেন এ ক্ষতির বাইরে। 'আর্থিক সঙ্কট : পশ্চিমা বনাম ইসলামী ব্যাংকিং' শীর্ষক নিবন্ধে মাইকেল বাসলার এ দুই ধারার বিনিয়োগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাব-প্রাইম মর্টগেজ সৃষ্ট সমস্যার সঙ্গে 'দুবাই ওয়ার্ল্ড'-এর ঋণ স্থবিরতা তুলনা করেন। পরিশেষে অনুমান করেন, ইসলামী ব্যাংকিং আইনের কারণে 'দুবাই ওয়ার্ল্ড সুকুক' ক্রেতারা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এ ঘটনার স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাবও খতিয়ে দেখেছেন তিনি।

'ইসলামী ব্যাংকিং' জার্নালের চলতি সংখ্যার প্রবন্ধগুলো ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের চর্চা আরো গতিশীল করা এবং এ শিল্প নিয়ে কিছু প্রশ্নের জবাব দানে সহায়ক হবে। পাশাপাশি তা সংশ্লিষ্ট ছাত্র, গবেষক ও পেশাজীবীদের চিন্তার খোরাক জোগাবে বলে আমাদের আশা। গবেষক, প্রবন্ধকার, অনুবাদক ও পাঠকের প্রতি 'ইসলামী ব্যাংকিং' বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে আমাদের কাছে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করছি। তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ হবো। সার্বিক প্রয়াস সত্ত্বেও কিছু ভুলত্রুটি বর্তমান লেখাগুলোতে থেকে গেছে। আমরা সবার সহৃদয় মার্জনা এবং মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ কামনা করছি।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : কৌশলগত প্রবণতা

মনজের কাহ্‌ফ

সূচনা

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইসলামী অর্থনীতির নবজাগরণের ফলস্বরূপ জন্ম নেয় ইসলামী ব্যাংক। ১৯৪০'র দশকের শেষ দিকে ইসলামী অর্থনীতির ওপর পাক-ভারত উপমহাদেশের লেখকেরা ইংরেজি ও মধ্যপ্রাচ্যের লেখকরা আরবি ভাষায় লেখালেখি শুরু করেন। ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নের কৌশলগত প্রবণতা অনুধাবনের জন্য সাম্প্রতিক ইতিহাসে এর শেকড়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া জরুরি। যদিও এর সব কিছুই সাম্প্রতিক বললে অত্যুক্তি হবে না। ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে যেসব লেখা রয়েছে তাতে ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে একটি বাজারব্যবস্থা হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়। এটা শুধু ইসলামী আইন তথা শরী'আহ্ অনুসরণ করে চলে।[১] ১৯৫০ ও ১৯৬০'র দশকের শুরুর দিকে সুদ নিষিদ্ধের বিষয়টি মাথায় রেখে সুদমুক্ত ব্যাংকিং নিয়ে যে লেখালেখি হয় তার পরিণতিতে বহু দূরের দুটি দেশ মিসর ও মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যদিও এই দুই পরীক্ষণ আক্ষরিক অর্থে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ছিল না তবুও এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক নামে একটি আন্তঃসরকারি ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে।[২] ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের বর্তমান সদস্য ৫৬টি দেশ। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইন্দোনেশিয়া থেকে গিনি-কোনাক্রি পর্যন্ত বলতে গেলে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর সংখ্যা বর্তমানে ২০০ ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া আকারে ছোট হলেও উত্তর আমেরিকায় বেশ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান "ইসলামী রীতির অর্থায়ন" হিসেবে পরিচিত চুক্তিভিত্তিক পদ্ধতিতে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে।

ড. মনজের কাহ্‌ফ, সিরিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান অধ্যাপক। ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়নের ওপর বিশেষজ্ঞ। ১৯৭৫ সালে ইউনিভার্সিটি অব উটাহ থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি করেন। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়েস্টমিনস্টার-এ বসবাস করছেন; কাজ করছেন ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়ন বিষয়ে পরামর্শক হিসেবে।

১ সম্ভবত সুদ-এর ওপর প্রথম নিয়ম-পদ্ধতিগত কাজ করেন অর্থনীতিবিদ আনোয়ার কোরেশি, ১৯৪৮ সালে। এরপর ১৯৫৫ সালে মোহাম্মদ উজাইর এবং ১৯৬২ সালে বাকের আল সদর।

২ আসলে, প্রথম দু'টি ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ছিল মূলত উন্নয়নকেন্দ্রিক। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকিং-এ তাদের উৎসাহ ছিল কম। দুবাই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন একজন সামুদ্রিক বাণিজ্যপোতের ব্যবসায়ী এবং তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে ব্যাংকটি পরিচালনা শুরু করেন। সেসময় ইসলামী ব্যাংকিং আইনের উন্মেষ সবে শুরু হয়েছে। এই ব্যাংক তখন যতটা না ব্যাংকিং কার্যক্রম, তারচেয়ে বেশি মার্চেন্ডাইজ ট্রেডিং-এ বেশি উৎসাহী ছিল। এ পর্যায়ে ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে মিসর, জর্ডান ও সুদানে পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়।

বিগত চার দশকে দুটি আন্তঃসম্পর্কিত ঘটনা (phenomena) ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক কর্মব্যবস্থায় অনুষঙ্গী হয়েছে : নতুন ব্যাংকিং কৌশল উদ্ভাবন এবং ওলামা ও ব্যাংকারদের মধ্যে একটি নতুন শক্তিজোট (power alliance)-এর উত্থান। এই ব্যাপারগুলো মজ্জাগতভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। কারণ, উদ্ভাবিত ব্যাংকিং কৌশলগুলো কারণ ও ফলাফল দু'দিক থেকেই ছিল জোটের শ্রমের ফসল। তারা ভবিষ্যৎ দিনগুলোর জন্যও এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিকে রূপ দেন। এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য হলো ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ভবিষ্যৎ প্রবণতা সূত্রবদ্ধকরণ ও উন্নয়নে উপরোক্ত দুই ঘটনার কারণ ও সেগুলোর ফলাফলের ওপর আলোকপাত করা। এই গবেষণাপত্রে যেসব বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলো হলো :

ওলামা ও ব্যাংকারদের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তোলা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং ইসলামী ব্যাংকিং পেশার ভবিষ্যৎ প্রবণতার ওপর এর প্রভাব;

জোট কর্তৃক ব্যাংকিং কলা-কৌশল উদ্ভাবন এবং ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এগুলোর প্রবর্তন;

বর্তমান কৌশলগত উপাদানগুলো কিভাবে ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ উন্নয়নকে এগিয়ে নেবে তা আগেভাগে অনুধাবন করা।

ওলামা/ব্যাংকার কৌশলগত সম্পর্ক

মজার বিষয় হলো, ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর প্রথম কলম ধরেন পাকিস্তানি এক ব্যাংকিং অর্থনীতিবিদ (উজাইর)। অন্য দিকে, আরব জাহান থেকে এ বিষয়ে প্রথম লেখা আসে একজন শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞর (আল-সদর) কাছ থেকে। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, মিসর ও মালয়েশিয়ায় প্রথম যে দুটি ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে সেগুলো শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলছিল। তাই, প্রথম দুটি ইসলামী ব্যাংক দুবাই ইসলামী ব্যাংক ও আইডিবি তাদের নিজস্ব শরী'আহ্ বোর্ড প্রতিষ্ঠায় তেমন নজর দেবে না বলেই ধরে নেয়া হয়েছিল।[৩]

বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে সত্তরের দশকের শুরু পর্যন্ত সুদমুক্ত ব্যাংক সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা নিয়ে লেখালেখি মুসলমানদের মননে নতুন চিন্তার খোরাক জোগায়। এসব লেখনী বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম জনগণকে ইসলামী ব্যাংকের কামনায় ব্যাকুল করে তোলে। এর প্রতিষ্ঠাতাদের তারা ধর্মীয় বীর হিসেবে সম্মানিত করে। কিন্তু, দুবাই ব্যাংক ও আইডিবির মাধ্যমে যখন পুরোদস্তুর ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হলো, তখন তাদের সামনে অনুসরণ করার মতো কোনো ব্যাংকিং মডেল পাওয়া গেল না। সম্ভবত তাদের ব্যবস্থাপনাগত পার্থক্যের জন্য আইডিবি যেখানে একটি পেশাদার পাবলিক-সেক্টর ব্যাংকার/অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পরিচালনা পদ্ধতি গ্রহণ করে, সেখানে দুবাই ইসলামী ব্যাংক গ্রহণ করে ব্যবসায়িক গতিপথ। এর একটিরও শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর সঙ্গে তেমন কোনো সংশ্রব ছিল না।

৩ আইডিবির এখনো কোনো শরী'আহ্ বোর্ড বা কমিটি নেই এবং ১৯৯৯ সালে পুনর্গঠনের পরেই কেবল দুবাই ইসলামী ব্যাংক একটি শরী'আহ্ উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করে।

একটি জোটের জন্ম

বলতে গেলে ১৯৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মিসর ও জর্ডানে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিকালেই ব্যাংকার ও শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক যোগাযোগের সূচনা ঘটে। দু'টি ব্যাংকেরই ব্যাংকিং আইন থেকে বিশেষ বিমুক্তি এবং এ ব্যাপারে নিজ নিজ দেশের সরকারের কাছে আবেদনের প্রয়োজন ছিল। তাই তারা সহায়তা পেতে সরকারের 'ইসলামবিষয়ক দফতরে' আবেদন করে। প্রস্তুতি কমিটির শরী'আহ্ সদস্যদের নিয়ে নবগঠিত ব্যাংকগুলো 'শরী'আহ্ পরিষদ/বোর্ড' গঠন করে। মূলত তখনই শুরু হয় একটি নতুন মেরুকরণের। মিসরের ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক (১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা) এবং জর্ডান ইসলামিক ব্যাংক (১৯৭৮) উভয়েরই নিজস্ব আনুষ্ঠানিক শরী'আহ্ উপদেষ্টা/পরামর্শক ছিল। সুদানিজ ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক (১৯৭৮) ও কুয়েত হাউজ অব ফাইন্যান্স (১৯৭৯) প্রতিষ্ঠাকালে এবং পরবর্তীতে আরব জাহান, তুরস্ক, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং অতিসম্প্রতি পাকিস্তানে বেসরকারি খাতের ইসলামী ব্যাংকগুলোতেও ওই ধারা অব্যাহত আছে। সরকার ব্যাংকিং খাতকে পুরোপুরি ইসলামীকরণ করার আগেই ১৯৮০-এর দশকে পাকিস্তানে, ১৯৮০-এর দশকের শেষ ও ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ইরানে এবং ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সুদানে ইসলামী ব্যাংকগুলো নিজ নিজ দেশে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত শরী'আহ্ প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশ, পশ্চিম আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ছিল সৌদি আরবের প্রিন্স মোহাম্মদ আল-ফয়সাল ও সালেহ কামেল, কুয়েত-এর আহমেদ আল-ইয়াসিন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাঈদ লুতাহ, জর্ডানের সামি হামুদ এবং মালয়েশিয়ার হালিম ইসমাইল-এর মতো কতিপয় স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির উদ্যোগের ফসল। শুরুতে এই উদ্যোগগুলো মিসরের আহমেদ আল নাজ্জার ও ইসা আবদু ইব্রাহিমের মতো ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু যাকে ইসলামী পুঁজিবাদ বলা যেতে পারে (পরিভাষাটি যদি কিছুটা শিথিলভাবে ব্যবহার করা হয়) একসময় সে তার সত্যিকার মিত্র ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের পরিবর্তে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের মাঝে খুঁজে পায়। প্রিন্স মোহাম্মদ আল ফয়সাল যখন ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা গ্রহণ করেন তখনই তিনি একে গতিশীলতা দিতে সক্ষম ছিলেন। ১৯৭৬ সাল থেকে তিনি এর স্বাক্ষর রেখে চলছিলেন। ফয়সাল ইসলামী ব্যাংকের শাখা তত দিন পাকিস্তান থেকে গিনি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য, ১৯৮৬ সালে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব সাইপ্রাস-এর পতনের পর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত আল-নাজ্জারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্রিন্স প্রথম থেকেই জানতেন যে আল নাজ্জারের সঙ্গে সম্পর্ক তাকে মিসরে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংকের জন্য কোনো সম্ভাবনাময় ক্লায়েন্ট বা দেশটির সরকারের কাছ থেকে কোনোরকম আশীর্বাদ এনে দেবে না। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়াননি অনেক কারণে। তিনি জানতেন, এ ধরনের ঘনিষ্ঠতা তাকে মিসর বা আরব দেশগুলোর ব্যবসা খাতের সঙ্গে নিবিড় হতে সাহায্য করবে না। তার একজন যোগ্য মিত্র ছিলেন মিসরের সাবেক গ্রান্ড মুফতি। তিনিই পারেন সরকারের সঙ্গে সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে 'ফয়সাল'কে গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা দিতে। এতে বিশ্বে প্রথম (ফয়সাল) ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছ থেকে যে বিশেষ আইন জারি করিয়ে নেয়ার দরকার ছিল তার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়।

প্রায় একই সময়ে জর্ডানে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সামি হামুদ এবং মিনিস্ট্রি অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড আওকাফ এবং সালেহ কামেল-এর নেতৃত্বে কতিপয় উদ্যোক্তার মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। ইসলামী বৈধতা এবং মূলধন উভয়ই প্রয়োজন ছিল সামি হমুদ-এর। মিনিস্ট্রি অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড আওকাফ এবং জেনারেল অফিস অব ফতোয়া'র কাছে শরী'আহ্সংশ্লিষ্ট বৈধতা চাওয়া হয়। তাই এ কাজে জর্ডানের একজন সাবেক গ্রান্ড মুফতিকে নিয়োগ দেয়ার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? ওলামা ও ব্যবসায়ী থেকে ব্যাংকারে পরিণত হওয়া ব্যক্তিদের একটি নতুন কৌশলগত মিত্রতার জন্ম হয়। এই মিত্রতার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং আমাদের সময় পর্যন্ত তা ক্রমাগত সুদৃঢ় হয়েছে।

নবসৃষ্ট ব্যাংকারদের দৃষ্টিতে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞরা অন্যান্য ইসলাম বিশেষজ্ঞের মতো নয়। বরং, তাদের সঙ্গে সাধারণ মুসলিম ব্যবসায়ী ও আয় সৃষ্টিকারীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ফলে তাদের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারে। মুসলিম অর্থনীতিবিদ ও অর্থবিষয়ক বুদ্ধিজীবীর চেয়ে মুসলমান জনসাধারণের সঙ্গে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের দৈনন্দিন যোগাযোগ অনেক বেশি। তাই নবসৃষ্ট ব্যাংকগুলোকে জনসাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করা ও এগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টিতে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞরা অনেক বেশি সক্ষম বলে মেনে নেয়া হলো। এর সবকিছুই করা হলো শরী'আহ্ মেনে চলার ব্যাপারে ব্যাংকের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। এই প্রতিশ্রুতি কেবল 'সুদ' নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল কেনাবেচা সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে বিস্তারিত 'ফিকাহ' প্রণয়ন, ইজারা বা লিজিং, মুদ্রা বিনিময়, ঋণচুক্তি এবং কোনো লেনদেন শরী'আহ্সম্মত কি না তা খতিয়ে দেখতে যেসব আইন ও নীতির প্রয়োজন হয় সেগুলোর ব্যাপারেও। তখন পর্যন্ত মুসলিম পেশাদার বুদ্ধিজীবী মহলের চিন্তা-চেতনা কেবল 'সুদ' থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খোঁজার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এসব কর্ম সাধারণত শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের (ফুকাহা) দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং তারাই এর ঘোষণা দেন। অন্য দিকে, এ বিষয়ে ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও পেশাদারদের জানাশোনা কম।

পেশাদার শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়েই সবসময় ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নের বিস্তৃতি ঘটেছে। ১৯৯০'র দশকের মাঝামাঝি ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থায় নতুন ধরনের লেনদেন 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড'-এর আবির্ভাব ঘটে। তখন এগুলো পশ্চিমা ব্যাংকার, ব্রোকার এবং 'হাউজ অব ফাইন্যান্স' দ্বারা পরিচালিত হলেও তাদেরকে পরিচালনা বোর্ডে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের নিতে হয়েছে। এটা করতে হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা পাওয়ার জন্য। আমানতকারীদের আস্থা অর্জনের জন্য এটা ছিল অপরিহার্য। ১৯৭০'র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ্বের চতুর্দিকে যত সেমিনার, সভা, সম্মেলন ও সিম্পোজিয়াম হয়েছে সেগুলো ইসলামী ব্যাংকার ও শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের এই নতুন জোটকে আরো শক্তিশালী করেছে এবং পারস্পরিক কর্ম-সম্পর্কের ফলপ্রসূ উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

অধিকন্তু, গঠনের পর্যায় এবং জনসংযোগের ক্ষেত্রে অতি জরুরি হলেও শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা সবসময় 'পরামর্শ দানের ক্ষমতা'র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।[৪] সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শরী'আহ্ বোর্ড অংশ নেয় না বা ইসলামী ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলীর কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ করায় কোনো ভূমিকা রাখে না। ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা প্রায়ই শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেয়। শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের মতামত নেয়ার কথা বলা হয় আসলে সময়ক্ষেপণ ও অধিকতর পর্যালোচনার জন্য। যাতে জনগণের আস্থা না হারিয়ে কাজটি করা যায়। যেকোনো অবস্থায় সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে থাকে ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকদের বোর্ড এবং ব্যবস্থাপনাও থাকে তাদের সঙ্গে। তাদের সবাই বোঝেন যে ওলামাদের সঙ্গে জোট আসলে তাদের ব্যবসায়িক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণেই কাজ করছে। অন্য দিকে, সকল ইসলামী ব্যাংক একটি পুরোদস্তুর আর্থিক সেবার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থেকে যায়, যা লেনদেন প্রক্রিয়ায় ইসলামী আইন মেনে চলে।[৫]

ব্যাংকিংয়ে ওলামা-ব্যাংকারদের অনুসৃত কৌশল

লেনদেন সম্পর্কিত ফিকাহ্-র দুটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি থেকে সুদমুক্ত ইসলামী অর্থায়নের উদ্ভব ঘটেছে। বিনিময় চুক্তিতে জড়িত দুটি পক্ষের বাধ্যবাধকতার মধ্যে ভারসাম্য এবং বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা এর প্রকৃত প্রতিফলন। সাধারণত বাস্তব পণ্যের ভিত্তিতে ব্যাংকের অর্থায়নকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো মূলধনী সম্পদ, ইনভেনটরি, ভোগ্যপণ্য এবং ভবিষ্যতে মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে সীমিতপর্যায়ের কিছু সেবা দিয়ে থাকে। এগুলোই এক কথায় ইসলামী অর্থায়ন।

সত্যিকারের আয় ভাগাভাগি করে নেয়া হবে এমন 'প্রজেক্ট ইকুইটি ফাইন্যান্সিং' কর্মকাণ্ডে ইসলামী ব্যাংক সেভাবে অংশ নেয় না। বিক্রি বা ইজারার ভিত্তিতে যখন অর্থায়ন করা হয় তখন ব্যাংকার কেবল অতি স্বল্পসময়ের জন্য পণ্যটির মালিক হতে গিয়ে যতটুকু ঝুঁকি নিতে হয় কেবল সেটুকু ঝুঁকিই বহন করে। উভয় ক্ষেত্রে, বাজার শক্তির ভূমিকা ব্যাংকারদের মুনাফা নির্ধারণ করে। এটা প্রত্যক্ষভাবে হয় একটি বর্ধিত মূল্যহার অথবা পরোক্ষভাবে অর্থায়নকারী ও উপকারভোগীদের মাঝে মুনাফা বণ্টনের হারের ভিত্তিতে। লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থায়ন হলো একধরনের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ। এতে ব্যাংকারদের মনযোগ তার বিনিয়োগের লাভজনকতার (profitability) ওপর কেন্দ্রীভূত থাকে।

---

৪ কিছু কিছু ইসলামী ব্যাংক তাদের শরী'আহ্ বোর্ডকে গ্রাহকদের সঙ্গে বিরোধে সালিশের দায়িত্বও দিয়ে থাকে। এই কাজ আলেমদের গণসংযোগ ভূমিকারই একটি অংশ। এর মাধ্যমে তারা জনগণকে বুঝাতে চান যে ব্যাংক শরী'আহ্ নীতিমালাই মেনে চলছে।

৫ কিছু কিছু লেখক ইসলামী ব্যাংকগুলোকে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়েও বড় কিছু হিসেবে তুলে ধরতে চান। এটা ঠিক নয়। যেমন: ১৯৯৭ সালে লেখা এক নিবন্ধে তিমর কুরান বলেন, "ইসলামী ব্যাংকিং অর্থনীতি ও ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা উপেক্ষা করে। এটা আধুনিক সভ্যতার সৃষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ পরিমণ্ডলেও ধর্মীয় কর্তৃত্ব নিয়ে আসে। আইন হিসেবে শরী'আহ্ এবং ধর্মের মধ্যে পার্থক্যগুলোর প্রতি নিবিড় নজর দিলে বোঝা যাবে ইসলামী ব্যাংক কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়। এগুলো হলো পৌর প্রতিষ্ঠান যা শরী'আহ্ আইন মেনে চলার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। শরী'আহ্ বোর্ডের অ্যাডভাইজরি ক্ষমতা থাকলেও তাদের লিগ্যাল অ্যাডভাইজারদের মতো কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক কর্তৃপক্ষের অধীনে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ওপর কেবল সেগুলোর পরিচালনা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ থাকে।

সম্পদ সমাবেশ

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ১৯৫০'র দশকের মাঝামাঝি লেখা প্রথম দিককার সাহিত্যে সম্পদ সমাবেশের ব্যাপারে ইসলামিক ব্যাংকিং-এর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পওয়া যায়। সেখানে বলা হয়, মুনাফা প্রত্যাশিত হলে ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা-র ভিত্তিতে অথবা মূল-এর নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ঋণ হিসেবে তহবিল গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার এক দশক আগেই এসব বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। মুদারাবা বা বিনিয়োগ আমানতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিনিয়োগকালে আত্মত্যাগ। মুদারাবার চেতনা মূল-এর নিশ্চয়তা এবং নির্দিষ্ট মুনাফার বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নবসৃষ্ট ইসলামী ব্যাংক কর্মীদের জন্য সহজ ছিল না। কারণ তারা ছিল প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রশিক্ষিত।

আমানতকারী নয়, অংশীদার

যদিও প্রচলিত মেয়াদি আমানত (time deposit)-কে ভবিষ্যৎ মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ আমানতের আকারে পুনর্গঠনের ফলে যে 'কার্যত মুনাফার হার' সৃষ্টি হয় তা ব্যাংকিং ইতিহাসে একটি নতুন উদ্ভাবন। এখানেই প্রচলিত ব্যবস্থার প্রজ্ঞাকে ছাড়িয়ে গেছে ইসলামী ব্যাংক। এই প্রজ্ঞা কি ভালো? কেবল আল্লাহই তা ভালো জানেন। প্রাথমিক যুগে মুদ্রা বিনিময়কারীদের যে ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে ইউরোপে ব্যাংকব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে সেখানে আমানতকারী ও ব্যাংকারদের মধ্যে সম্পর্ক সবসময় ঋণ, জামিনদারি এবং কখনো কখনো নিশ্চয়তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এসব ঋণ ও তহবিলের ঋণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা! ব্যাংকিং পেশায় ঋণচুক্তির সময় মূল্য হিসেবে নির্ধারিত সুদকে 'নিশ্চিত' হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং একে 'অর্থের মূল্য' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী ব্যাংকিং এসে ওই প্রজ্ঞার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং ইসলামী ব্যাংকার ও তহবিল মালিকদের মধ্যে চুক্তিমূলক সম্পর্কের প্রকৃতিকেই বদলে দেয়। নতুন সম্পর্কটি তৈরি হয় একটি অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতার ভিত্তিতে। যেখানে বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকারদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেয়া হয় এবং তা থেকে মুনাফা অর্জনের পরে তা মূলধনের ভিত্তিতে ভাগাভাগি করে নেয়া হয়। এখানে মুনাফার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তহবিল মালিকদের যে মুনাফা দেয়া হয় তা আসলে 'কার্যত মুনাফা' এবং অনুমান-অনুমিতির বদলে প্রকৃত মুনাফার ভিত্তিতে (ex-post)। এমনকি মুদারিব হিসেবে ব্যাংকের অংশটিও প্রকৃত মুনাফার ভিত্তিতে।

ইসলামী ব্যাংকগুলো সব ধরনের আয়মূলক আমানতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ধরনের মুনাফা ভাগাভাগির নীতি অনুসরণ করে। ২০০০ সালে ছোট আকারের একটি ইসলামী ব্যাংক গতানুগতিক চর্চা থেকে অনেকটা সরে এসে শেয়ারহোল্ডার ও আমানতকারীদের সব তহবিল এক কাতারে নিয়ে আসে। স্বাভাবিক সরকারি জালিয়াতি নিয়ন্ত্রণ বিধি মোতাবেক এই অংশীদারিত্বের নীতি ব্যাংকারদের মধ্যে একধরনের কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করে। কারণ, তাদের সম্পদ সমাবেশের ক্ষমতা তাদের তহবিল ব্যবহারের প্রকৃত ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে এই ভাগাভাগির নীতি সম্পদ সমাবেশকে একটি দীর্ঘ

মেয়াদি কার্যক্রমে পরিণত করে যা অ্যাকাউন্টিং সাইকেল-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে প্রস্তাবিত সুদের হার-এ তড়িঘড়ি পরিবর্তন এনে রাতারাতি আমানত 'ছিনিয়ে নেয়া' হয়।

আমানতকারীদের অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা প্রয়োগের ফলে ব্যাংকের স্থিতিপত্রের জন্য বোঝা এমন সন্দেহজনক ঋণ এবং অন্যান্য সম্ভাব্য দায় ও লোকসানের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনার মনোভাবও বদলে যায়। যেহেতু প্রতি হিসাব-বর্ষ শেষে আমানতকারীদের মধ্যে মুনাফার অংশ ভাগাভাগি করতে হয়, তাই সম্ভাব্য দায়গুলো আড়াল, লুকানো বা এক পাশে সরিয়ে রাখার যেকোনো প্রচেষ্টা শেয়ারহোল্ডারদের ওপর ক্রমবর্ধমান নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এতে সহজাতভাবে শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফা আমানতকারীদের মধ্যে পুনঃবণ্টিত হতে থাকবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক নীতি কঠোর করলে আরো একটি পরিবর্তন দেখা যায়। বাণিজ্যিক ইসলামী ব্যাংকগুলো এ ধরনের সংকোচনমূলক নীতির নেতিবাচক প্রভাব সহজেই আমানতকারীদের ওপর স্থানান্তর করে দিতে পারে। এ ধরনের নীতির পুরো বোঝা নিজে বহন করার পরিবর্তে অন্তত সচ্ছলতার একটি পর্যায় পর্যন্ত ব্যাংক ও আমানতকারীদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেয়া হয়।[৬]

চলতি হিসাব-এর ব্যাপারে ব্যাংকারদের অবস্থান সুসংহত এবং চলতি হিসাবধারীদের মুনাফা থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে তাদের উদ্যোগকে বৈধতা দেয় আলেমদের সঙ্গে জোট। মিত্র আলেমদের কাছ থেকে সহায়তা ও সমর্থন নিয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো চলতি হিসাবধারীদের সঙ্গে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মতো একই ধরনের আচরণ করে। চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তকে ব্যাংকের ওপর ঋণ হিসেবে দেখা হয়। যদিও আসল কথা হচ্ছে এগুলোর একটি নির্দিষ্ট অংশ বিনিয়োগ করা হয় এবং তার মুনাফা ভোগ করেন ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডাররা। এটা বৈধতা দানের যুক্তি হলো চলতি হিসাব উদ্বৃত্তগুলো গ্যারান্টেড (guaranted)। তাই এগুলো থেকে মুনাফা ভাগ করার কোনো অধিকার নেই।[৭] সাধারণত ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ হলো শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটি। কিন্তু উপরোক্ত চর্চা তাদের মুনাফার পরিমাণ বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। শরী'আহ্ বোর্ড-এর দ্বারা আইনসিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি

---

৬ বেশিরভাগ ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ-তহবিল মালিকদের মধ্যে বিতরণযোগ্য প্রকৃত মুনাফা স্থির রাখার জন্য বিনিয়োগ-ঝুঁকি সামাল দিতে একটি তহবিল সৃষ্টি করে বা আর্থিক বরাদ্দ (provision) রাখে। এ ধরনের তহবিল দিয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো কার্যত বছরের পর বছর আমানতের বিপরীতে মুনাফা স্থির রাখতে সক্ষম হয়েছে। অধিকন্তু, একই বাজারে সুদি ব্যাংকগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখতে বিতরণকৃত মুনাফায় সহায়তা দিতে এই বিনিয়োগ-ঝুঁকি তহবিল ব্যবহার করা হয়। বিনিয়োগ আমানত-এর জন্য বিতরণযোগ্য তহবিল থেকে এই রিজার্ভ তহবিলে অর্থায়ন করা হয়।

৭ জোটের বাইরের আলেমরা চলতি হিসাবধারীদের পক্ষে সোচ্চার। যেমন, এর ফলাফল নিয়ে হাসান আব্দুল্লাহ আল আমিন-এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, এ ধরনের হিসাব একটি মুনাফা প্রত্যাশা করলেও জোটের আলেমরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। আল আমিন যুক্তি দেখান যে ডিমান্ড ডিপোজিট কখনো ঋণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ এতে ঋণ দেয়ার কোনো মানসিকতা থাকে না এবং চুক্তিমূলক সম্পর্কে এগুলোকে আমানত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। একইভাবে, ফিকাহ্-র পরিভাষাতেও ডিমান্ড ডিপোজিটকে অবশ্যই আমানত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ ওয়াদিয়া'হ এবং এগুলোর ওপর ওয়াদিয়া'হ-র বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে। তিনি আরো বলেন, এসব আমানত রাখা হয় সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ব্যাংক এগুলো তার বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করে ফিকাহ্-র ওয়াদিয়া'হ বিধান ভঙ্গ করে। এই লঙ্ঘনের ফলাফল দুটি : এটা ব্যবহারকারীর ওপর মূলের ব্যাপারে একটি গ্যারান্টি চাপিয়ে দেয় এবং এটা ওয়াদিয়া'হ ব্যবহারের ফলে প্রাপ্ত সব মুনাফা তার মালিককে দেয়। হাসান আব্দুল্লাহ আল আমিন, আল ওয়াদাই আল মাশরাফিয়াহ আল শারী'আহ্ আল ইসলামিয়াহ, দার আল সুরুক, জেদ্দা ১৯৮০।

সহজে খণ্ডন করা যায় এই যুক্তিতে যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদে শেয়ারহোল্ডারদের অংশ খুবই কম। খেলাপির বেলায় কোনো রকম দায়-এর গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে তা তেমন কাজে আসে না।[৮] তাছাড়া, চলতি হিসাবধারীদের পছন্দ থেকে বুঝা যায়, তাদের মধ্যে উদ্বৃত্তের ওপর মুনফার চেয়ে মূল্য প্রত্যাহার সুবিধা গ্রহণের প্রবণতা বেশি। ইসলামী ব্যাংকগুলো যদি বিনিয়োগ তহবিল তুলে নেয়ার ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করে তাহলে চলতি হিসাবধারীরা মনোভাব বদলে তাদের সঞ্চয় মুদারাবা-য় নিয়ে যেতে পারেন।[৯]

ইসলামী ব্যাংক এবং এর তহবিলের উৎসগুলোর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে মুদারাবা ও ঋণদানকে ব্যবহার ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিশ্লেষকদের মধ্যে তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ১৯৬০'র দশকে মিসরে যেসব গবেষণাকর্ম হয় সেগুলোর ভিত্তিতে এবং সুদি অর্থায়নের মতো ঋণ-উৎপাদনকারী অর্থায়ন থেকে দূরে থাকার জন্য ইসলামী ব্যাংকিংকে একটি মুনাফা ভাগাভাগির মডেল হিসেবে ধরে নেয়া হয়।[১০] এই মডেলের দুটি সংস্করণকে তাত্ত্বিক রূপ দেয়া হয়। এর একটি হলো দুই স্তরবিশিষ্ট মুদারাবা সংস্করণ। এতে ইসলামী ব্যাংককে একটি সাধারণ আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দেখা হয়েছে, যার একমাত্র ভূমিকা হলো সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে পুঁজি নিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে সরবরাহ করা। দ্বিতীয় সংস্করণে 'ডিমান্ড ডিপোজিট' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটা একটি দুই দরজাবিশিষ্ট মডেল। এখানে ১০০% রিজার্ভ রাখার শর্তে ডিমান্ড ডিপোজিট রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সরবরাহ করা হবে এমন মুদারাবা আমানত রাখাও অনুমতি দেয়া হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করলে বুঝা যাবে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের তত্ত্ব ও মডেলকে ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে মিশে বিপথে চলে গেছে। কারণ, তারা মুদারাবাভিত্তিক অর্থায়ন চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়।[১১]

তহবিল ব্যবহার

বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংককে তার নির্ধারিত মডেল-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে দূরে সরে যেতে দেখা যায়। তারা অর্থায়নের মূল যে ধরনটি অনুসরণ করে তা মুরাবাহা, মুদারাবা নয়। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে পশ্চিমা-শিক্ষিত মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা প্রভাব বিস্তার করে আছে– এমন ধারণা থেকে এক অর্থে আলেমদের সঙ্গে মিত্রতা সেগুলোকে রক্ষা করে। এসব বুদ্ধিজীবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়

---

৮ মনজের কাহফ, "ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা বণ্টন"। রিভিউ অফ ইসলামিক ইকনমিকস স্টাডিজ, খণ্ড ৩, নং ২, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১১৩-১১৪ (আরবি)

৯ ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণত বিনিয়োগ আমানতের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ করে। একমাত্র মিসরের ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক ২৪ ঘণ্টার নোটিশে বিনিয়োগ তহবিল প্রত্যাহার অনুমোদন করে। এর ফলে ব্যাংকটির স্থিতিপত্রে চলতি হিসাবের ঘরে স্বল্প ব্যালান্স ও বিনিয়োগ হিসাবে উচ্চ ব্যালান্স দেয়া যায়। অন্যসব ইসলামী ব্যাংকের চেয়ে এটা একটা ব্যতিক্রম।

১০ মোহসিন খান ও আব্বাস মিরাখোর, "মনিটরি ম্যানেজমেন্ট ইন এন ইসলামিক ইকনমি", ইসলামী ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স জার্নাল, খণ্ড ১০, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ এবং মোহাম্মদ আনোয়ার, মডেলিং ইন্টারেস্ট-ফ্রি ইকনমি, ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট, হার্নডেন, ভিএ, ১৯৯৭।

১১ আব্বাস মিরাখোর, "প্রগ্রেস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অব ইসলামিক ব্যাংকিং", রিভিউ অব ইসলামিক ইকনমিকস, খণ্ড ৪, নং ২, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১-১১।

আলেমরা ইসলামী ব্যাংকগুলোকে একটি বৈধতার ছায়া প্রদান করেন। একে আলেম ও ব্যাংকারদের মধ্যে কৌশলগত সাফল্যের ক্ষেত্রে বড়রকম অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিশেষ করে আমরা যদি দেখি এ ধরনের মিত্রতা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আইডিবি ও দুবাই ইসলামী ব্যাংকে একরকম নিষ্ক্রিয়তা কাজ করেছে এবং তাদের তহবিল কেবল ফলপ্রসূ পদ্ধতিতে (rewarding manner) ব্যবহার করতে হয়েছে। প্রথম দিকের লেখনীতে তহবিল বরাদ্দের বিষয়ে পর্যাপ্ত সমাধানসূত্র পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে সামি হামুদ শক্তিশালী যুক্তি তুলে ধরার পরই ১৯৭৬ সাল থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরী'আহ্ বোর্ড অর্থায়ন রীতিকে একটি নতুন পর্যায়ে নিয়ে যেতে শুরু করেন। অন্য দিকে, প্রথম দিকের লেখনী এবং মিসর ও মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা কেবল মুশারাকা ও মুদারাবার মতো প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[১২]

পণ্য অর্থায়ন

পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় অর্থায়ন হলো এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার সবেচেয়ে নির্বিরোধ ও অসাধারণ অবদান। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপানসহ পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্যাংকারদের অবদান স্পষ্ট। এমনকি বিংশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে মিসরের মতো উন্নয়নশীল দেশেও পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় অর্থায়নে সে যুগের ব্যাংকারদের উদ্যোগ ছিল অসামান্য। ব্যাংকাররা সেই আসল মনোযোগটি কোনোভাবে হারিয়ে ফেলেন। এরপর 'রিশিডিউলিং', 'ডেট ডিসকনটিনিউইং' এবং 'ফাইন্যান্স হোলসেল' ব্যাংকিং খাতের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থায়নকে আবার পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের ধারায় ফিরিয়ে আনে ইসলামী রীতি। এটি আর্থিক ও বাস্তব বাজারের মধ্যে ফাঁকা জায়গাটি পূরণ করে। ইসলামী ব্যাংকগুলো যেহেতু তাদের অর্থায়নকে বিক্রি, লিজ ও ইকুইটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে তাই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে বাস্তব পণ্য ও সেবা উৎপাদন বা বিনিময়ে সহায়ক হয় কেবল এমন অর্থায়ন পাওয়া যায়। ইসলামী ব্যাংকের এসব নীতি বাস্তব বাজারের সঙ্গে 'ওয়ান-টু-ওয়ান' সম্পর্ক তৈরি করে।[১৩]

তা ছাড়া, ইসলামী অর্থায়ন 'থাম্প অব মাইক্রো ফাইন্যান্স'-এর প্রচলিত বিধিও বদলে দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক স্থাবর সম্পত্তিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে 'শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটি এবং চলতি ব্যয়, বেতনাদি ও ইনভেনটরিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ ব্যবহার করে।' খুবই বিরল ঘটনা ছাড়া ইসলামী ব্যাংকগুলো বেতন বা চলতি ব্যয় নির্বাহ খাতে অর্থায়ন করে না। কারণ, ইসলামী রীতি একটি পণ্যভিত্তি বা পুনঃবিক্রির আগে সরবরাহ গ্রহণ দাবি করে। গ্রাহকরা ইসলামী ব্যাংকের কাছ থেকে মূলধনী পণ্য

---

১২ প্রথম যুগের লেখনীতে স্বপ্ন দেখা হয় যে ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবার ভিত্তিতে তহবিল জোগান দেবে। এটা ইসলামী ব্যাংকের কর্মীদের কাছ থেকে অর্থায়নের উপকারভোগীদের বিভিন্নভাবে দেখভাল করার পাশাপাশি প্রকল্প মূল্যায়ন, বাজার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান দাবি করে। মজার বিষয় হলো সামি হামুদের আগে তাত্ত্বিক লেখালেখিতে মুরাবাহা সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে তার একটি প্রবন্ধ ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইজারা (লিজিং) এবং বিশেষভাবে ইজারা ওয়া ইকতিনা (ক্রয়/লিজিং) ইসলামী ব্যাংকিংয়ের তত্ত্বে প্রবেশ করে মাত্র ১৯৯০'র দশকে। (দেখুন, মনজের কাহ্ফ, আল ইজারা আল মুনতাহিয়া বাই আল তামলিক [লিজিং থেকে মালিকানা], ২০০০ সালের ২২-২৮ সেপ্টেম্বর রিয়াদে অনুষ্ঠিত ওআইসি ফিকাহ্ একাডেমির ১২তম বার্ষিক সম্মেলনে এটি উপস্থাপন করা হয়।

১৩ ইসলামী ব্যাংকগুলোর চর্চা হচ্ছে লেনদেনের ১০০%-এর কম অর্থায়ন করা এবং বাকি অংশটুকু গ্রাহকের অর্থায়নের জন্য রাখা, তাদের ভাষায় যাকে "মার্জিন অব সিরিয়াস কমিটমেন্ট" বলা হয়।

এবং কাঁচামাল, মধ্যবর্তী বা চূড়ান্ত পণ্যের জন্য অর্থায়ন আশা করতে পারেন, কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি দেয়ার জন্য তা আশা করতে পারেন না। ইসলামী ব্যাংক যেসব ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে : (১) নতুন উৎপাদনশীল প্রকল্প প্রতিষ্ঠা, (২) উৎপাদন/ভোগ্যপণ্য কেনা, বা (৩) উৎপাদনশীল মেশিনারি, ইকুইপমেন্ট, আবাসন ও ভোক্তাসামগ্রী।

পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ে ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নের বিষয়টি শরী'আহ্‌র গভীরে নিহিত। শরী'আহ্ সুনির্দিষ্টভাবে প্রচলিত ব্যাংকের দুটি প্রধান মুনাফা অর্জনকারী অর্থায়ন নিষিদ্ধ করেঃ ক) সাধারণ উদ্দেশ্যে অর্থায়ন, যা সিজনাল বা নন-সিজনাল যেকোনো উদ্দেশ্যই হোক না কেন তা কেবল সরকার এবং/বা করপোরেট বাজেটের সম্পূরক। এ ধরনের অর্থায়ন সাধারণত উপকারভোগীর বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর নির্ভর করে; এবং খ) ঋণ পরিপক্বতার সময় পরিবর্তন বা সেগুলোর চূড়ান্ত মালিকানা পরিবর্তনসহ যেকোনো ধরনের 'রিশিডিউলিং' অর্থায়ন। এই দু'ধরনের অর্থায়নকে শরী'আহ্-এ কেবল জনকল্যাণমূলক অর্থায়ন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কুরআন (২:২৮০) এবং সুন্নাহ-এ এর ইঙ্গিত রয়েছে।

অর্থায়ন এবং পণ্য উৎপাদন ও বিতরণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রচনা কেবল কর্পোরেট অর্থায়নের ব্যাপারে প্রচলিত জ্ঞানকেই তছনছ করে দেয়নি এটা অর্থায়নের আকারেও সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। এই অর্থায়ন উৎপাদন ও বিনিময়ের আকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটা 'পরজীবী' ধরনের অর্থায়ন বিলুপ্ত করে। অর্থায়নের ইসলামী রীতিকে মূল ধারার ব্যাংকিং-এর মেরুদণ্ডে পরিণত করা গেলে, সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যে অর্থায়ন স্তর প্রকৃত বাজারের ওপর বোঝা সৃষ্টি করে তা পুরোপুরি বিলুপ্ত না হলেও কমে আসবে।

সুদ বিলোপের পথে

মুসলিম অর্থনীতিবিদ ও অর্থায়ন বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের মনোযোগ যখন সুদ বিলোপের প্রতি নিবদ্ধ তখন ব্যাংকার ও আলেমদের মধ্যে জোট ইসলামী ব্যাংকগুলোকে কেবল সুদমুক্ত আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবেই রূপদান করেনি, এগুলোকে নৈতিক মানের মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। আলেম ও ব্যাংকারদের কৌশলগত মিত্রতা ইসলামী ব্যাংককে এমন এক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে যা সব শরী'আহ্ বিধি মেনে চলে এবং তা ব্যাংকিং পেশার চর্চায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। আর এই নতুন মাত্রাটি হলো বিনিয়োগ বাছাইপ্রক্রিয়ায় একটি নৈতিক মানদণ্ড যুক্তকরণ।[১৪] ভালো ব্যাংকারদের সবসময় 'মানিমেকার' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাদের অঙ্গীকার কেবল পেশাগত নৈতিকতার প্রতি, যা কেবল বিশ্বাসযোগ্যতা ও সততার সঙ্গে সম্পর্কিত। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের একনিষ্ঠ ও সত্যিকার আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে হবে। যেহেতু 'রিবা' ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে শরী'আহ্-র নিষেধাজ্ঞা তেমন একটা নেই, তাই 'ইসলামী' হওয়ার জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ নির্ধারিত মান মেনে চলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১৪ ইসলামী ব্যাংকের নৈতিক অঙ্গীকার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। কারণ শরী'আহ্-র বিধিবিধানগুলো সবসময় নৈতিকতাপূর্ণ। সকল ইসলামী ব্যাংক তার পরিচয়ের মধ্য দিয়েই নৈতিকতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও প্রচলিত ধারার হাতে গোনা কিছু ব্যাংক কেবল স্বঘোষিত নৈতিক মান অনুসরণ করে।

ইসলামী ব্যাংক হলো এমন ব্যাংকার যে শরী'আহ্-এ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমন পণ্য/সেবায় অর্থায়ন করে না। তাই তামাক, জুয়া, ক্যাসিনো, মাদক, অ্যালকোহল, অস্ত্র, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পণ্য প্রভৃতিতে অর্থায়ন করে না ইসলামী ব্যাংক এবং এগুলো তার কর্মপরিধির বাইরে থাকে।

ইসলামী ব্যাংক : ব্যাংকার না বণিক?

ওলামা ও ব্যাংকারদের জোট ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বিশেষায়নের (specialization) ওপর গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে প্রথম বাণিজ্যিক ইসলামী ব্যাংকের জন্মলগ্ন থেকে এগুলোর মধ্যে দুটি পরিচালনাগত পদ্ধতি দেখা যায়। এর একটি হলো শুধু আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। যেখানে ব্যাংক কোনো ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ না করে কেবল গ্রাহকের অনুরোধ ও উদ্যোগে সাড়া দেয়। ইসলামী ব্যাংক অব জর্ডান, ফয়সাল গ্রুপ অব ব্যাংকস ও অন্যান্য ইসলামী ব্যাংক এর বড় উদাহরণ। এই ধারণা অনুযায়ী, তহবিল ব্যবহারকারী থেকে সবসময় অর্থায়নের লেনদেন শুরু হতে হবে। অন্য দিকে, একটি ব্যবসায়িক ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয় 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ'। আর্থিক মধ্যস্থতাকারী ছাড়াও এই ধারণায় ইসলামী ব্যাংকগুলোকে শো-রুম খোলা, গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ এবং বর্ধিত মূল্যে (মুরাবাহা) গ্রাহকদের কাছে বিক্রির জন্য পণ্য কেনার অনুমতি দেয়া হয়। বেশিরভাগ মিত্র আলেম এই ধারণার সমর্থক। তারা ইসলামী ব্যাংকগুলোকে পণ্যবাজারে প্রতিযোগিতা করার কথা বলেন। অসাবধানতাবশত হলেও কুয়েত, মিসর, সুদান, জর্ডান এবং সম্ভবত অন্য যেসব দেশে বিশেষভাবে ইসলামী ব্যাংকের জন্য বিশেষ আইন ও ডিক্রি জারি করা হয়েছে সেখানে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা কেবল অর্থায়নের মধ্যস্থতাকারীতে সীমাবদ্ধ না রেখে পণ্য কেনা-বেচারও অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই ধারণাটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়ন বিশেষজ্ঞ উভয়ের বিরক্তির ফসল। বিশেষভাবে কুয়েত কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন কেএইচএফ-এর ওপর তার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রয়োগ শুরু করে তখন এই অস্বস্তিকর অবস্থা প্রকাশ পায়। কেএইচএফ সমর্থকদের তীব্র বিরোধিতার কারণে এক পর্যায়ে কুয়েতে ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রণয়নের প্রস্তাব ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে।

ওলামা-ব্যাংকারদের যৌথ কৌশলগত প্রবণতা

ওলামা এবং ইসলামিক "বুর্জোয়া"দের মধ্যে কৌশলগত জোট মুসলিম দেশগুলোর সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি নতুন শক্তিকাঠামোর জন্ম দিয়েছে। এটি স্বল্পমেয়াদে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য সংগ্রাম এবং দীর্ঘমেয়াদে ইসলামী অর্থায়ন ও ব্যাংকিং আন্দোলন সৃষ্টির ওপর প্রভাব ফেলছে।

কৌশলগত মিত্রতায় সুফল

মুসলিম ধনীদের একটি অংশ ও আলেমদের ঐক্যবদ্ধ করার পেছনে কাজ করেছে বেশ কিছু কারণ। মুসলিম বুর্জোয়া ও ব্যাংকারদের ক্ষেত্রে দেখা যাবে আলেমদের সঙ্গে জোট তাদেরকে বেশ কিছু সুবিধা দেয়।

প্রথমত, নতুন ব্যাংকগুলোর সঙ্গে লেনদেন করতে সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে বোধ সৃষ্টির জন্য এটা সবচেয়ে ভালো হাতিয়ার। এক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষসহ দেশী-বিদেশী পুরো ব্যাংকিং খাত, ইসলামী ব্যাংগুলোর বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্র সেকুলার মিডিয়া এবং সর্বোপরি ইসলামী ব্যাংকগুলো যে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে মুসলমানদের মনে দীর্ঘদিন ধরে যে সন্দেহ-সংশয় ছিল তা মনে রাখা আমাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, নিষিদ্ধ সুদযুক্ত লেনদেন-এর কারণে অতীতে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশ করেনি এমন নতুন গ্রাহক শ্রেণী সৃষ্টির জন্য এই জোট একটি 'লিভারেজ' হিসেবে কাজ করে। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং তাদের কাছ থেকে আমানতকারী ও অর্থায়ন ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশ নিয়ে আসার পেছনেও রয়েছে এই জোট। ১৯৯০'র দশকের মাঝামাঝি সৌদি আরবের ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংকের 'ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস' বিভাগ পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, 'সত্যিকারের ইসলামী' বলে বুঝানো গেলে প্রচলিত ব্যাংকের এক-তৃতীয়াংশের বেশি গ্রাহক ইসলামী আর্থিক সেবা গ্রহণের দিকে ঝুঁকবেন।[১৫]

তৃতীয়ত, গণসংযোগের জন্যও ব্যবহৃত হয় এই জোট। বিশেষ করে নতুন ব্যাংকারদের জন্য তাদের নতুন অবস্থান প্রতিষ্ঠা এবং সরকার, স্থানীয় গণমাধ্যম ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে যুক্তিতর্কের পাশাপাশি, প্রচলিত ব্যাংকের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্যও এটা ছিল খুবই জরুরি।[১৬]

চতুর্থত, আমানতকারী, সুপ্ত শেয়ারহোল্ডার ও বিনিয়োগ ব্যবহারকারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এক ধরনের 'বাফার' তৈরি করে এই জোট ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রধান শেয়ারহোল্ডার ও পেশাদার ব্যবস্থাপকদের পক্ষে কাজ করে। কারণ, এসব ব্যক্তিকে সাধারণত গ্রহণ করা হয় প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে। তাছাড়া ব্যাংকার, বিনিয়োগকারী ও শেয়ারহোল্ডাররা পারস্পরিক সুরক্ষার জন্য শরী'আহ্

---

১৫ সাঈ'দ আর মুরতান, *Transformation to Islamic Banking: the Experience of the NCB*, ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে কাসারাংকায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সেমিনারে উপস্থাপিত।

১৬ ইসলামী ব্যাংকগুলো আলেমদের কাছ থেকে ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়তা পেলেও তথাকথিত 'ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি'গুলো শরী'আহ্ উপদেষ্টা নেয়া অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করে। এসব কোম্পানি দুই ধরনের মানুষের মধ্য থেকে তাদের গ্রাহক বেছে নেয়: যাদের কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে (মুখের কথা দ্বারা) ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে পৌঁছানো যাবে এবং যারা রাতারাতি মুনাফা করার জন্য উন্মুখ। ১৯৭০'র দশকের মাঝামাঝি সৌদি আরবে এ ধরনের কোম্পানি গজিয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত বহু মানুষের সঞ্চয় বিলীন হয়ে যায় এবং এসব কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা/মালিকদের শেষ পরিণতি হয় মক্কার কারাগারে। ১৯৮০'র দশকের শেষ দিকে মিসরে এবং কিছুটা স্বল্প আকারে সিরিয়ায় একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আইনের ফাঁক-ফোকর গলিয়ে মিসরে ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি নামে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গজিয়ে ওঠে। এগুলো জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল সঞ্চয় সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় এবং এগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল বড়মাপের মুনাফা প্রদান। আসলে এই মুনাফা দেয়া হতো নতুন সংগ্রহ করা আমানত থেকে। এখানে কেবল নতুন আমানত সংগ্রহের পরিমাণকেই বিবেচনায় নেয়া হতো *(pyramidal cumulative effect)*, প্রকৃত বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা হতো না বললেই চলে। ইসলামী ব্যাংক ও তাদের সহযোগী আলেমদের পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও অর্থায়ন বিশেষজ্ঞরা এসব কোম্পানির তীব্র বিরোধিতা করলেও মিসরের কিছু সোচ্চার ইসলামী ব্যক্তিত্ব এগুলোর পক্ষে অবস্থান নেয়। তারা বিরোধিতাকারীদের 'ইসলামী বিনিয়োগ কোম্পানির বিরুদ্ধে সরকারি চক্রান্ত' হিসেবে আখ্যায়িত করে। এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহলো আলেমদের তেমন সমর্থন না পাওয়ায় এসব 'ইসলামী' বিনিয়োগ কোম্পানি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

বোর্ডকে ব্যবহার করছে বলে ব্যাংক আল তাকওয়া-র শরী'আহ্ বোর্ডের ১৯৯৮ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়।[১৭]

আলেমদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই জোট এমন এক সময় তাদেরকে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে নিয়ে এসেছে যখন এটা তাদের জন্য ছিল খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে এ সময়টিতে উদীয়মান ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর কারণে তাদের বেশিরভাগ কোনোঠাসা হয়ে পড়ছিল।[১৮] নতুন জোট তাদের মনে এক ধরনের কৃতিত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এই নতুন ভূমিকার মধ্য দিয়ে আসলে তারা আজীবন ইসলামী ফিকাহ্-র যে শিক্ষা দিয়ে আসছিলেন তা বাস্তবায়নের সুযোগ পান। এটা মুসলিম জনসাধারণের মাঝে তাদের ভাবমূর্তি উন্নত করে। তারা আজীবন মানুষেকে ব্যবসায়িক লেনদেনে ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার যে উপদেশ দিয়েছেন এটা এক অর্থে তার পরিপূরক। এই জোট আলেমদেরকে আয়ের একটি নতুন উৎস এবং নতুন জীবনযাত্রার সন্ধান দেয়। বিমানে বা কখনো ব্যক্তিগত জেটে ভ্রমণ, পাঁচতারকা হোটেলে রাত্রিযাপন, মিডিয়ার মনযোগ আকর্ষণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উঁচু তলার মানুষের কাছে মতামত পৌঁছানো, ফিকাহ্ গবেষণা এবং নতুন ধারার ব্যাংকাররা যেসব ফিকাহ্সংশ্লিষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলো সমাধানের জন্য অর্থের বিনিময়ে দায়িত্ব পাওয়া ইত্যাদি।

ব্যাংকারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আলেমদেরকে সমাজে গতানুগতিক অবস্থার চেয়ে উচ্চ অবস্থানে নিয়ে যায়। অনেক ইসলামী ব্যাংকে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞরা ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর মতো পদে আসীন হয়েছেন। এমনকি একজন শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞকে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদে দায়িত্ব পালন করতে দেখি।[১৯] আলেমদেরকে সমাজের সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল অবস্থানে নিয়ে আসা মুসলিম সমাজের জন্য একটি বড় অর্জন এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি বড় পরিপূরণ। বস্তুত এর মধ্য দিয়ে তারা নিজ দেশ এমনকি বিদেশেও সেলিব্রেটি ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

---

১৭ ১৯৯৮ সালে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার পতন ঘটে। ওই বছরের শেষে দেয়া ব্যাংকের রিপোর্টে দেখা যায়, মুদারাবা আমানত ও শেয়ারহোল্ডারদের পুঁজি উভয় ক্ষেত্রে ২৩%-এর বেশি লোকসান হয়েছে। শরী'আহ্ লঙ্ঘন প্রতিরোধের ব্যাপারে কর্তৃত্বের স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করে শরী'আহ্ বোর্ড রিপোর্ট দেয় যে 'ব্যবস্থাপনা শরী'আহ্ আইন লঙ্ঘন করেনি' এবং আরো অগ্রসর হয়ে বলে বোর্ড অব ডিরেক্টরস ও ব্যবস্থাপনা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, তাদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তগুলোও সুচিন্তিত ছিল। এরপরও যে লোকসান হয় তা কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্কটের কারণে। বছর শেষে ব্যবস্থাপনার তরফ থেকে দেয়া রিপোর্টেও একই দাবি করা হয়। কিন্তু ২০০০ সালে ব্যবস্থাপনার একটি পত্র থেকে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়। এতে পরোক্ষভাবে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন ও প্রজ্ঞা উপেক্ষা করে 'সব ডিম একই ঝুড়িতে রাখা'র মতো মাত্র একটি প্রকল্পে ব্যাংকের যাবতীয় সম্পদের ৬০% বিনিয়োগের কারণে বিপর্যয় ঘটে বলে স্বীকার করা হয়।

১৮ একটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের ইতিহাসজুড়ে দেখা যাবে, শাসকদের পরামর্শ দানের ক্ষেত্রে আলেমরা সবসময় মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা সাধারণ মানুষকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। ইবনে হাম্বল, আল নওয়াবি, ইবনে আব্দ আস সালাম, ইবনে তাইমিয়ার মতো এমন অসংখ্য আলেমের উদাহরণে ইসলামের ইতিহাস ভরপুর। অতীতে ইসলামী, অনৈসলামিক নির্বিশেষে সব ধরনের শিক্ষা খাতের প্রধান আয়ের উৎস ছিল ওয়াক্ফ। মিসরে মোহাম্মদ আলীর সময় ওয়াক্ফ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে চলে আসে। অটোমান সাম্রাজ্যের শাসনকালে ১৮৫৬ সালে যে আওকাফ আইন করা হয় তাতে ওয়াক্ফ সম্পত্তির ওপর সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আলেমরা সরকারের কর্মচারীতে পরিণত হন। এর ফলে তারা জীবিকার স্বাধীন উৎস হারান এবং সেই সঙ্গে নেতৃত্বের মর্যাদাটিও চলে যায়।

১৯ সুদানের ব্যাংক আল তাদামান ও দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসব ঘটনা ঘটে।

ইসলামী অর্থায়ন ও ব্যাংকিং-এর প্রবণতা

এই নতুন জোট একটি নতুন কৌশলগত প্রবণতার জন্ম দিয়েছে যা ইসলামী ব্যাংকিং শিল্প, ওলামাসহ সার্বিকভাবে মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করছে। তাছাড়া, ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিস্তার এবং এগুলোর অর্থায়নের ধারণা এমন এক যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছে যা অর্থায়ন ও ব্যাংকিং-এর ভবিষ্যৎ প্রবণতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়। এটা প্রমাণ করেছে : এটা করা যায়। তাই, তিন দশক ধরে ইসলামী ব্যাংকগুলো যে ১০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

প্রথমত, আলেম ও ব্যাংকারদের কৌশলগত সম্পর্ক অর্থায়নের নতুন ধরন উদ্ভাবন দ্রুততর করে। প্রথম দিকে অর্থায়নের মাত্র একটি ধরন ছিল– মুদারাবা। এর মাধ্যমে আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অর্থায়নের ধারণা উদ্ভাবন বা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তা আসলে বাণিজ্যিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় গতি আনে। ক্রয়াদেশদাতাকে (purchase orderer) ইজারা প্রদানের ধারণা ওলামা ও ব্যাংকারদের যৌথ উদ্ভাবন। এর সঙ্গে সালাম এবং সমান্তরাল সালাম যুক্ত হয় কৃষি ও হালকা শিল্পে অর্থায়নের জন্য। এমনকি আইডিবির মতো 'রক্ষণশীল' প্রতিষ্ঠান, যে কিনা তার অর্থায়ন কার্যক্রমকে বহুবছর কেবল মুদারাবা ও মুশারাকাহ্-র মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে, তাও একসময় আর্থিক প্রকৌশলের পথে অগ্রসর হয় এবং ক্রয়াদেশদাতাকে ইজারা প্রদান শুরু করে। এরপর নিজস্ব অর্থায়ন চুক্তি ত্রিপক্ষীয় ইসতিসনা ও সমান্তরাল-ইসতিসনা উদ্ভাবন করে। এগুলো এখন উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে অর্থায়নের জন্য আইডিবির নতুন ও প্রধান চুক্তিতে পরিণত হয়েছে। নতুন অর্থায়ন চুক্তি উদ্ভাবন কখনো শেষ হবে না এবং ওলামা ও ব্যাংকারদের মধ্যে ঐক্য অর্থায়নের নতুন নতুন ধারণা পেশ করছে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে : ঋণ ও বাস্তব সম্পদ রয়েছে এমন কোনো বিনিয়োগ বান্ডেল-এর 'সোয়প সেল' (swap sale)। এটি মাধ্যমিক বাজারে অর্থায়নে জন্য একধরনের চুক্তি, যেখানে তারল্য অর্থায়ন ও সুদভিত্তিক ঋণের বিকল্প হিসেবে বিলম্বিত-পরিশোধে বিক্রির সঙ্গে নগদে বিক্রির সম্মিলন ঘটে। ওলামা ও ব্যাংকারদের সহযোগিতা 'পাবলিক ডেট মার্কেট'-এ পৌঁছে গেছে এবং তা আইএমএফ-এর সহায়তা ও সমর্থনে সুদান ও ইরানে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পাবলিক ফাইন্যান্সিং ইনস্ট্রুমেন্ট-এর উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী অর্থায়নের নব উদ্ভাবিত বেশিরভাগ ধরন বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবং তা ইসলামী ব্যাংকিং-এর সীমানা ছাড়িয়ে মূলধারার ব্যাংকিং পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী ব্যাংকের বিস্তৃতি মুনাফাপ্রত্যাশী বহু মানুষকে এই নতুন বাজারে টেনে এনেছে। এটা ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রসারে বাড়তি উপাদান যুক্ত করে। আলেমগণ মূলত জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির কাজ করেন এবং তাদের কল্যাণে বেশিরভাগ মুসলিম দেশে সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচিতি লাভ করেছে। ইকুইটি, আমানত, সম্পদ ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো আকারে বড় হচ্ছে এবং ক্রমেই নতুন নতুন ব্যাংকের সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৯০-১৯৯৭ মেয়াদের মধ্যে ১২টি শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.২%, সেগুলোর আমানত বৃদ্ধি পায় ৭.৯%, ইকুইটি বৃদ্ধির হার ছিল ৯.০%। অন্যদিকে, ওই দেশগুলোর একই আকারের ১২টি প্রচলিত

ধারার ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি, আমানত ও ইকুইটির প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৫.৬, ৪.৯ ও ৫.৬ শতাংশ। অধিকন্তু, ওই ১২টি ইসলামী ব্যাংকের সার্বিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ৯.৬%। একই সময়ে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর এই প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৩.৩%।[২০] তাছাড়া, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, সৌদি আরব, বাহরাইন ও কাতারসহ অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে বহু সংখ্যক নতুন ইসলামী ব্যাংক জন্ম নেয় অথবা প্রচলিত ব্যাংক রূপান্তরিত হয় ইসলামী ব্যাংকে। তাই, ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের প্রবৃদ্ধি মোটামুটি ১০% গ্রহণ করাই নিরাপদ। বিগত তিন দশক ধরে শিল্পটি এই হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে।[২১]

তৃতীয়ত, ব্যাংকার/ওলামা জোট শরী'আহ্ সংক্রান্ত গবেষণা জোরদার করেছে। আর্থিক খাতে শরী'আহ্ গবেষণা জোরদারের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ভূমিকা রয়েছে। মরহুম শেখ মোস্তফা আল জারকার মতে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইসলামী পুনর্জাগরণের পর থেকে ইসলামিক স্টাডিজের বিভিন্ন বিষয়ের মতো ফিকাহ্ গবেষণাকাজও এগিয়ে চলে। তবে বলা যায়, বিগত ৩ দশকে অন্য যেকোনো বিষয়ের চেয়ে আর্থিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফিকাহ্ গবেষণা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। যদিও গবেষণামূলক প্রকাশনা এবং পিএইচডি ও মাস্টার্স পর্যায়ে ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বোঝার জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উপাত্ত নেই, তারপরও বিষয়টি অনুধাবনের জন্য ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ওআইসির ফিকাহ্ একাডেমির প্রথম ১৩ বছরের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ। এর ৯৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ৫১টি ছিল আর্থিক ও অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে।[২২]

বিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর উদ্যোগ ও স্পন্সরশিপে সকল ফিকাহ্ গবেষণার একটি বড় অংশ এবং প্রতিবছর বহুসংখ্যক বিশেষায়িত সেমিনার, কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, ফিকাহ্সংক্রান্ত অভিমত ও বিধানগুলোর আধুনিকায়নে সাহায্য করেছে নতুন এ জোট। এটা সমসাময়িক আর্থিক লেনদেনগুলোকে শরী'আহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরতে সহায়ক হয়েছে। আলেমদের সঙ্গে বিরোধ কেবল সুদ নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে নয়। তারা বলছেন, ব্যাংকের ইসলামীকরণের মানে হলো এর প্রতিটি চুক্তি, লেনদেন ও ম্যানুয়াল ক্লিয়ারেন্স-এর জন্য শরী'আহ্ বোর্ডের কাছে পেশ করতে হবে। ফিকাহ্সংক্রান্ত অভিমত প্রকাশের জন্য ফকিহদেরকে ব্যাংকার, অর্থায়নকারী ও অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে বসে প্রতিটি লেনদেনের বিস্তারিত জানতে হবে এবং নতুন প্রযুক্তি, কার্যপ্রণালি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। কারণ, এগুলো ফকিহদের জন্য নতুন বিষয়।

---

২০ মুনাওয়ার ইকবাল, *Islamic and conventional bankimg in the nineties: a comparative study,* ইসলামিক ইকনমিক স্টাডিজ, খণ্ড ৮, নং ২, পৃ: ১-২৭।

২১ বিগত বছরগুলোতে প্রকাশিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর ডিরেক্টরি এবং ফুয়াদ এ. আল-ওমর, *"Future of Islamic Banks under the Globalization of Economies"* (আরবি), ১০ নভেম্বর ১৯৯৭, বাহরাইনে "একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন" শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থাপিত নিবন্ধ।

২২ বাকি ৪৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ২০টি চিকিৎসাগত, ১১টি প্রশাসনিক, ১৪টি বিভিন্ন বিষয়ে এবং একটি আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে দেয়া ৩০টি ইস্যুর বিষয়ে। এসব ইস্যুর বেশিরভাগ আবার অর্থবিষয়ক।

ফিকাহ্ গবেষণা আধুনিকায়নের দীর্ঘ যাত্রাপথে ইসলামী ব্যাংকে লেটার অব ক্রেডিট, ফরেন এক্সচেঞ্জ হেজিং-এর গ্যারান্টি ও অ্যাকসেপটেন্স, সিন্ডিকেটেড ফাইন্যান্সিং, ইনভেস্টমেন্ট সোয়প, টাইম শেয়ারিং, ইত্যাদির প্রবর্তন ঘটেছে। নতুন নতুন ইস্যুর তালিকা প্রতিদিনই দীর্ঘ হচ্ছে এবং জমা হচ্ছে শরী'আহ্ বোর্ডের টেবিলে। বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা ও কনফারেন্সে এসব ইস্যুর যাচাই-বাছাই চলছে। ইসলামী ব্যাংকারদের তত্ত্বাবধানেই এসবের আয়োজন হচ্ছে।

চতুর্থত, ওলামা এবং ইসলামী ব্যাংকারদের ঐক্য মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক সংসক্তি (coherence) জোরদারে ভূমিকা রাখছে। ইসলামী ব্যাংকের অনেক প্রকল্পে অর্থায়নের সুফলভোগী একসময় তাদের উৎপাদনশীল সম্পদের মালিকে পরিণত হয়। এসব অর্থায়ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র হস্তশিল্প, ট্যাক্সি ড্রাইভার, গৃহায়ন ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি। আলেমগণ সাধারণত এ ধরনের কর্মসূচি উৎসাহিত ও সমর্থন করেন। যেমন সুদানে 'ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান-ওয়েস্ট' ক্ষুদ্র কৃষক ও কুটির শিল্পীদের জন্য একটি সফল কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এরপর সুদানের ক্ষুদ্র শিল্পগুলোকে অর্থায়নের জন্য ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক একই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে।[২৩] জর্ডানে 'ইসলামিক জর্ডান ব্যাংক' ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মালিকানা লাভের সুযোগ করে দিতে ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা ধরনের অর্থায়ন কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এবং আল-আরাফা ইসলামিক ব্যাংকের নিজ নিজ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি রয়েছে। যদিও তা গ্রামীণ ব্যাংকের তুলনায় পরিসরে অনেক ছোট, কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো উপকারভোগীদের কাছ থেকে অনেক কম চার্জ গ্রহণ করে। অন্য দিকে, দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের ওপর বার্ষিক ২২ শতাংশের বেশি সুদ ধার্য করে গ্রামীণ ব্যাংক।[২৪] ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এ পর্যন্ত আমি, ইসলামী ব্যাংকগুলো যেসব উপকারভোগীকে অর্থ জোগান দিচ্ছে এবং তাদের ব্যবসার আকার নিয়ে কোনো পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ কোথাও পাইনি। এ ধরনের গবেষণা জরুরি বলে আমি মনে করি। তবে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে আমার বারবার যাতায়াত, তাদের প্রতিবেদন পাঠ ও সেগুলোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপচারিতা এবং তুরস্ক, বাংলাদেশ, সুদান, জর্ডান, তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়ার মতো দেশগুলোর ঋণ বাজারের আকার ও ঋণ বিতরণ এবং সেসব বাজারে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অংশের ব্যাপারে যে সাধারণ তথ্য পাওয়া যায় তাতে বুঝা যায় যে বেশিরভাগ ইসলামী ব্যাংকের অর্থ যাচ্ছে মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে। আমি ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও পর্যবেক্ষণ থেকে জানি যে ১৯৮৯ সালে সুদানে "অভ্যুত্থানে"র আগে প্রতিষ্ঠিত ৬টি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে ৫টির অর্থায়ন ছিল একটি নতুন ও উদীয়মান নন-ট্র্যাডিশনাল ব্যবসায়ী শ্রেণী সৃষ্টির প্রয়াস।[২৫] ওলামা-ব্যাংকারদের

---

২৩ ওসমান বাবিকর, *Financing micro industries, the experience of the Sudanese Faisal Islamic Bank*, আইআরটিআই, জেদ্দা, ১৯৯৭।

২৪ লেখায় উল্লিখিত ৩টি ব্যাংকের ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের প্রতিবেদন।

২৫ ১৯৮৮/৮৯ সালে সুদানে আরো দুটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান-নর্থ এবং ব্যাংক অব ওয়ার্কার্স। তবে সেখানে অভ্যুত্থানের আগে এগুলোর তেমন কোনো কার্যক্রম ছিল না। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে কিছু ইসলামী ব্যাংক তাদের অর্থায়নের একটি বড় অংশ প্রধান শেয়ারহোল্ডার এবং তাদের অংশীদার ও সহযোগীসহ ঘনিষ্ঠ মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। বিশেষ করে, ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান ও সৌদি আরবের একটি ব্যাংকের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়।

এই ঐক্য মুসলিম সমাজের ধনিক শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ (ব্যাংকার ও বড় ব্যবসায়ী), মধ্যবিত্ত শ্রেণী (আইনজীবী, অর্থনীতিবিদ, আমানতকারী, আমলা এবং ব্যাংকের অর্থায়ন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন এমন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা) এবং এমনকি দরিদ্র ও অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নের একটি অভিন্ন ক্ষেত্রে এনে সমবেত করেছে।[২৬] এই শেষোক্ত শ্রেণী ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রান্তিক কার্যক্রম, বিশেষ করে জাকাত বিতরণ থেকে উপকৃত হচ্ছে।[২৭] এই সৌহার্দ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে এখনো পুরোপুরি গবেষণা হয়নি। তবে ইয়েমেনের মতো অনুন্নত দেশেও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকার ও তাদের কর্মকাণ্ড সমর্থন ও এগুলোর প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো এমনভাবে আলেমদের বাছাই করে তারা এক দিকে যেমন সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন তেমনি গ্রহণযোগ্য হবেন সাধারণ মানুষের কাছে। প্রতিষ্ঠানগুলো দু'তরফ থেকেই কট্টরদের এড়িয়ে চলে। তারা কথিত সরকারের তোষামোদকারী আলেমদের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে না। এটা প্রত্যাশিত বা সম্ভাব্য গ্রাহক শ্রেণীর কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্টের কারণ হতে পারে। একই সঙ্গে তারা এমন আলেমদের এড়িয়ে চলে যারা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বা তাদের মুখপাত্র। তা নাহলে ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। দুবাইয়ে প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইসলামী ব্যাংকাররা সরকারের সঙ্গে একধরনের সুসম্পর্ক রক্ষা করে আসছে। মিট ঘামারের অভিজ্ঞতা থেকে তারা ভালো শিক্ষা পেয়েছে। অন্যসব ইসলামী ব্যাংক নিজ নিজ সরকারের সঙ্গে একধরনের অংশীদারিত্বে প্রবেশ অথবা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক রক্ষার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন শ্রেণীকে ক্ষুব্ধ করতে পারে, কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়িক পর্যায়ে এমন সব সম্পর্ক এড়িয়ে চলে। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের ধরন বুঝে পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ও শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা নির্বাচনের নীতি হেরফের হয়।

ইসলামী ব্যাংকগুলো সহযোগী আলেম হিসেবে মধ্যপন্থীদের অনেককে গ্রহণ করে। এক অর্থে এই জোট সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে শক্তিকাঠামো এবং এর বিন্যাস পুনর্গঠনে সহায়ক হয়। আমরা যদি সুদান, তুরস্ক, পাকিস্তান ও ইরানকে ব্যতিক্রম হিসেবে আলাদা করে রাখি তাহলে দেখবো অন্যান্য মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার দৃশ্যপট বদলে দিয়ে একটি নতুন শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টিতে

---

২৬ বেশিরভাগ আলেম সাধারণত আসেন দরিদ্র শ্রেণী থেকে। মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা এর কারণ। পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এতে ক্যারিয়ার ও পেশার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপের কারণে চিরাচরিত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য আর্থিক সম্পদ লাভ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে শরী'আহ্ শিক্ষা একরকম দরিদ্র শিশুদের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হয়। কারণ, তাদের বেশিরভাগ পিতা-মাতা সন্তানদেরকে সরকারি বা বেসরকারি স্কুলে পাঠানোর মতো খরচ চালাতে ছিলেন অপারগ। বেশিরভাগ শরী'আহ্ শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীদের বোর্ডিং সুবিধা দেয়া হয়। এসব বোর্ডিং পরিচালিত হয় দাতব্য, দান-সদকাহ ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় থেকে।

২৭ বেশিরভাগ ইসলামী ব্যাংক সেগুলোর শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটি থেকে পাওয়া জাকাত বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অনেক ব্যাংক তাদের আমানতকারীদের কাছ থেকে জাকাত কেটে নিয়ে তা বিতরণ করে। এর ফলে অনেক ইসলামী ব্যাংকে বেশ বড় আকারের জাকাত বিতরণ বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। এদের সঙ্গে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষ ও অন্যান্য স্থানীয় দাতব্য সংস্থার যোগাযোগ থাকে। মিসরের সোস্যাল নাসের ব্যাংক ও ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক এবং কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ-এর বড় উদাহরণ।

সহায়ক হয়েছে। আকারে ক্ষুদ্র হলেও এই নতুন শক্তিকেন্দ্রে রয়েছে আলেমদের একটি অংশ। এরা গবেষণা ও ব্যবহারিক উভয়ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, আর্থিক ও ব্যাংকিং লেনদেনকে ইসলামীকরণের সঙ্গে জড়িত। একটি নতুন ও উদীয়মান মুসলিম ধনী ব্যাংকার শ্রেণী, উদ্যোক্তা ও নির্বাহী এবং ইসলামপন্থীদের প্রতি বিরূপ নয় এমন সেকুলারপন্থী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও পেশাদার ও বুরোক্র্যাট হিসেবে এর সঙ্গে যুক্ত।[২৮]

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ভবিষ্যৎ

ইসলামী ব্যাংকিং হলো একটি উন্নয়নমূলক আন্দোলন এবং ব্যাংকিং পেশা ও অনুশীলনের নবসংস্করণ। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের অস্তিত্বের মাধ্যমে একটি বাস্তব সম্ভাবনার উদাহরণ সৃষ্টি এবং এমন এক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাস্তব রূপদানে সফল হয়েছে যা নৈতিকতা-বান্ধব, আমানতকারীদের সাড়া আদায় এবং একই সঙ্গে উৎপাদন ও বাস্তব বাজারের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অন্য কথায়, ইসলামী ব্যাংকিং আদর্শ একটি বিকল্প ক্ষেত্র সৃষ্টির বদলে মূল ধারার ব্যাংকিং-এর তাত্ত্বিক কাঠামোতে সুন্দরভাবে মানিয়ে যায়।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতিবিষয়ক সাহিত্যে ইসলামী ব্যাংকিংকে একটি মুনাফা ভাগাভাগির ধারণা হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[২৯] এই ধারণার দুটি ধারা তাত্ত্বিক রূপ পেয়েছে। একটি হলো দুই স্তরবিশিষ্ট মুদারাবা - এতে ইসলামী ব্যাংককে দেখা হয়েছে একটি ভেঞ্চার ক্যাপিট্যাল-এর সাধারণ আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে। দ্বিতীয়তটি হলো টু-উইনডো, যা ১০০% রিজার্ভ ক্যাপিট্যাল-এর শর্তে ডিমান্ড ডিপোজিট-এর অনুমতি দেয়। বাস্তব ক্ষেত্রে সকল ইসলামী ব্যাংক ওই দুটি তাত্ত্বিক ধারার মৌলিক বৈশিষ্ট্য থেকে সরে গেছে। এগুলো অর্থায়নের প্রধান যে ধরনটি অনুসরণ করে তা মুদারাবা নয়, মুরাবাহা। এভাবে দেখলে মনে হবে, ইসলামী ব্যাংক তার তত্ত্ব ও ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এবং মূল ধারার ব্যাংকিং-এ ঢুকে বিপথে চলে গিয়েছে।[৩০] এই তত্ত্ব অনুযায়ী, ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য যাত্রা শুরুর ধারায় ফেরত আসা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমা শিক্ষিত মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে ধারণাটি প্রভাব বিস্তার করে আছে তা থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে এক অর্থে রক্ষা করে আলেমদের সঙ্গে জোট। আলেমগণ ইসলামী ব্যাংককে একটি বৈধতার আব্রু দিয়ে রক্ষা করেন। এই আব্রু পশ্চিমা ধারার বুদ্ধিজীবীদের চ্যালেঞ্জ মেকাবেলায় সহায়ক হয়।

ইসলামী ব্যাংকের আসল চ্যালেঞ্জগুলো আসছে আর্থিক সেবার উদারীকরণ (liberalization), বিনিয়ন্ত্রণ (deregulation) ও বিশ্বায়ন (globalization) থেকে। ডব্লিউটিও'র সম্প্রসারণের সঙ্গে

---

২৮ বিশেষ ক্ষেত্রে 'ইসলামী ব্যাংক-কাম-ওলামা'দের মধ্যে ভিন্ন প্রবণতা দেখা যায়। সুদান, তুরস্ক, পাকিস্তান ও ইরানের আর্থ-রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা রয়েছে। বিশেষ ঘটনাগুলো এই নিবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

২৯ মোহসেন খান ও আব্বাস মিরাখোর, *Monetary Management in an Islmaic Economy*, জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, খণ্ড ১০, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ এবং মোহাম্মদ আনোয়ার, *Modelling Interest-Free Economy*, ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট, হার্নডেন, ভিএ, ১৯৯৭।

৩০ আব্বাস মিরাখোর, *Progress and Challenges of Islamic Banking*, রিভিউ অব ইসলামিক ব্যাংকিং, খণ্ড ৪, নং ২, ১৯৭৭, পৃ: ১-১১।

আসছে এগুলো। এর ফলে মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতি বিপুলায়তনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। এগুলোর রয়েছে শক্তিশালী ভিত্তি, উঁচু মাপের দক্ষতা এবং নতুন, ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর তুলনায় বিরূপ পরিবেশে টিকে থাকার অনেক বেশি ক্ষমতা। তাত্ত্বিকভাবে ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের ফাংশনাল লিবারালাইজেশন ইসলামী ব্যাংকগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ করবে। কারণ, বিনিয়ন্ত্রণের ফলে সেগুলো তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবহারের জন্য নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক বেশি নমনীয় হতে পারবে। ফাংশনাল লিবারালাইজেশন-এর ফলে নতুন ধরনের 'ইসলামিক' অর্থায়ন গ্রহণ করা হলে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সামনেও বিনিয়োগ ও প্লেসমেন্ট অপরচুনিটির মতো 'ইসলামিক' ব্যবসার জন্য প্রতিযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে।

ব্যাংকিং শিল্প একীভূতকরণের একটি জোরালো প্রবণতা প্রত্যক্ষ করলেও ইসলামী ব্যাংকগুলো এখনো ছোট ও খণ্ডিত আকারের এবং নিরুপায় গ্রাহকশ্রেণীর কারণে সম্ভাব্য বিশেষ সুবিধার ওপর নির্ভর করে আছে। বিগত দশকে ইকুইটি প্রবৃদ্ধি ৯ শতাংশে উন্নীত হওয়ার পরও একটি ইসলামী ব্যাংকের গড় পুঁজি এখনো ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নিচে এবং মোট সম্পদের গড় ৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কম।[৩১] গত ৫ বছরে বাহরাইন, বাংলাদেশ ও আরব আমিরাতে একাধিকসংখ্যক ইসলামী ব্যাংকের জন্ম হয়েছে। সৌদি আরবে একটি ব্যাংক প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে ইসলামীব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং বাহরাইনে দুটি ছোট ইসলামী ব্যাংক ও একটি ইসলামী বিনিয়োগ কোম্পানি একীভূত হয়।

একই সময়ে এইচএসবিসির মতো একটি মেগা-ব্যাংক তার 'ইসলামী অর্থায়নকার্যক্রম' সম্প্রসারিত করে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে 'ইসলামী বাজারে' প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করছে বেশ কিছু আমেরিকান ব্যাংক। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ইসলামী অর্থায়ন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর একটি সুবিধাজনক অবস্থান রয়েছে। বাণিজ্যিক ইসলামী ব্যাংকগুলো লাভের মুখ দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত আর্থিক নীতির সঙ্কোচনের ফলে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব আমানতকারীদের ওপর স্থানান্তর করতে পারে অথবা অন্তত একা পুরোটা বহনের পরিবর্তে ব্যাংক ও আমানতকারীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারে।[৩২]

---

৩১ ডাইরেক্টরি অব ইসলামিক ব্যাংকস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স, ১৯৯৬, দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস, জেদ্দা, সৌদি আরব (আইএআইবির সর্বশেষ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে, সংস্থাটি এখন বন্ধ)। এখানে লক্ষণীয় যে ১৬৬টি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে ৯২টির পুঁজি ১০ মিলিয়ন ডলারের বেশি নয়। ১০০ মিলিয়ন ডলার বা তারচেয়ে বেশি অংকের পুঁজি রয়েছে মাত্র ১৭টির। এগুলোর মধ্যে ৯টি আবার ইরানের রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক। গড় মোট সম্পদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। যদিও গড় মোট সম্পদের পরিমাণ ৮২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, মাত্র ২৩টি ব্যাংকের ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে ১০টি ইরানের (ইরানি মুদ্রার সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণে এই সংখ্যায় হেরফের ঘটে); ৮৫টি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে যেগুলোর মোট সম্পদ গড়ে ১০০ মিলিয়ন ডলারের কম।

৩২ বিনিয়োগকারী-আমানতকারীদের মধ্যে প্রকৃত মুনাফা বিতরণ স্থিতিশীল রাখতে বেশিরভাগ ইসলামী ব্যাংক একটি বিনিয়োগ-ঝুঁকির রিজার্ভ ফান্ড সৃষ্টি করে। এই তহবিলের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো কার্যত বছর-বছর বিনিয়োগের ওপর মুনাফা স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়। তাছাড়া, কম লাভের সময় একই বাজারে সুদি ব্যাংকগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখতে মুনাফা বিতরণের সময় এই বিনিয়োগ-ঝুঁকি তহবিল থেকে সহায়তা দেয়া হয়। বিনিয়োগ আমানতের জন্য বিতরণযোগ্য মুনাফার অংশ থেকে এই রিজার্ভ তহবিলে অর্থ জোগান দেয়া হয়।

আকারে ছোট হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো সাশ্রয়ী (economies of scale) সুবিধা ভোগ করতে পারে না। এগুলোর দক্ষ প্রযুক্তির অভাব রয়েছে বা তাতে প্রবেশ সুবিধাও সীমিত। এছাড়া সেগুলোকে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কারিগরি, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। এখানে এরকম কিছু উল্লেখ করা যায়: ইসলামী ব্যাংকগুলো শরী'আহ্ প্রমিতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারি উভয়ক্ষেত্রে নিম্নমানের দক্ষতা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ও কখনো কখনো অকার্যকর তত্ত্বাবধান মান, বিপণনে সৃজনশীলতার অভাব এবং গ্রাহকসন্তুষ্টির প্রতি অপর্যাপ্ত সংবেদনশীলতা সমস্যায় ভোগে।

অধিক সম্পদ আহরণ ও অধিকসংখ্যক বিনিয়োগ প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর একীভূত বা সমন্বয় সাধন এবং তাদের পুঁজি ও দক্ষতার মান সর্বোচ্চপর্যায়ে উন্নীত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে একীভূতকরণ (merger) শুধু কাঙ্ক্ষিতই নয়, সেগুলো যদি এই মেগা-ব্যাংকের যুগে টিকে থাকতে চায় তাহলে তা অবশ্য করণীয়। বামন ব্যাংকগুলো হবে ক্ষণজীবী। আন্তর্জাতিক বাজারের অবারিত সাগরে পৌঁছাতে চাইলে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে যুতসই আকার, পর্যাপ্ত পুঁজি, যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ আমানত সংগ্রহ এবং সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করতে হবে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর টিকে থাকার জন্য প্রথম প্রয়োজন হলো একীভূতকরণ ও সম্প্রসারণ। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকরা কারো একচেটিয়া অধিকারে নেই এবং তারা এর বাইরেও চলে যেতে পারেন। ইসলামী বিনিয়োগ তহবিলের মতো বিনিয়োগের অনেক বিকল্প চ্যানেল ইতোমধ্যে দৃশ্যপটে হাজির হতে শুরু করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিজ দেশ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকের বাইরেও অনেক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম, উইনডো, শাখা কাজ করছে।

অনেক আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে ইসলামী শরী'আহ্র মতামতগুলো এখনো প্রায়োগিকভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়নি। তাই বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের শরী'আহ্ বোর্ডগুলোকে প্রায়ই একই সমস্যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে দেখা যায়। ফলে, তাদের দেয়া পরামর্শগুলোর মধ্যেও থাকে বিস্তর ফারাক।[৩৩] শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এখনো এমন অনেক অস্পষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে। বিশেষ করে যখন নতুন ব্যাংকিং পণ্যের প্রশ্ন আসে।[৩৪] সব পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রমিতকরণ করা প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকের অস্তিত্বের কারণ নির্ণয় নিয়ে এটা শুরু করতে হবে যেমন, ব্যাংকিং লেনদেনগুলো শরী'আহ্ভিত্তিক বিধিবদ্ধকরণ। শরী'আহ্র দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বিধিবিধানের জন্য মতামতে ভিন্নতা প্রকাশ পায় এমন আলাদা আলাদা শরী'আহ্ বোর্ডের পরিবর্তে একটি অভিন্ন প্লাটফর্ম সৃষ্টি করা যায়। রিপোর্ট, ব্যালান্স শিট ও অন্যান্য আর্থিক বিবরণী প্রমিতকরণের প্রয়োজন রয়েছে। হিসাব পদ্ধতি, বিভিন্ন লেনদেনের সংজ্ঞা এবং ম্যানুয়ালগুলোও প্রমিতকরণ করতে হবে।

---

৩৩ যেমন, কিছু কিছু শরী'আহ্ বোর্ড যাচাইয়ের জন্য প্রতিটি চুক্তি তাদের কাছে পেশ করার জন্য ব্যবস্থাপনাকে বলে। আবার অন্যরা প্রমিত ব্যাংকিং চুক্তিগুলো পর্যালোচনার মধ্যে তাদের হস্তক্ষেপ সীমাবদ্ধ রাখে।

৩৪ ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ও শরী'আহ্ বোর্ড উপদেষ্টাদের মধ্যে সম্পর্কটি ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের কাছে স্পষ্ট করতে না পারাই ছিল লন্ডনে আল-বারাকা ব্যাংকের বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে বিশেষ কারণ।

এ জন্য, ১৯৮০'র দশকের শেষ দিকে বাহরাইনে প্রতিষ্ঠিত বোর্ড অব একাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অব ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্সকে দ্রুততার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সকল ইসলামী ব্যাংকের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হবে। ইসলামী ব্যাংকের লেনদেনগুলো প্রমিতকরণ করা গেলে সেগুলো ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনসাধারণের উপলব্ধিই কেবল জোরদার হবে না, তা ইসলামী ব্যাংকিংকে ভৌগোলিকভাবে ছড়িয়ে দিতেও সহায়ক হবে। এতে অধিকতর সেবা দানে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্য জোরদার হবে। এটা ইসলামী অর্থায়নের ধারণা প্রয়োগের বিষয়টিও জোরদার করবে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোকে জনবলের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ থেকে সৃষ্ট আরেকটি কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে অত্যন্ত দ্রুত এগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। ফলে ব্যাংকগুলোর জনবলকে এই নতুন কৌশলের সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত করে তুলতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দানের সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়নি। বেশিরভাগ ইসলামী ব্যাংক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিয়েই প্রচলিত ব্যাংক থেকে জনবল সংগ্রহ করেছে। তাছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ করপোরেশনের সাধারণ মনোভাব হলো, তারা যেন প্রশিক্ষণে বিশ্বাস করে না। এতে শরী'আহ্ আইন পুরোপুরি অনুধাবনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়। ফলে তারা নতুন ধরনের ইসলামী অর্থায়নের বিভিন্ন ধরন ও আমানত চুক্তির বেশিষ্ট্য সম্পর্কে গ্রাহকদের ধারণা দিতে পারেন না। তাছাড়া ব্যাংক/গ্রাহক সম্পর্ক ও সেবাগুলোর ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর মতো একই ধরনের কৌশল এখানে অনুসরণ করা হয় না।

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এই জনবল সমস্যাকে আরো তীব্র করে তোলে সৃজনশীলতা সমস্যা। যদিও বিগত তিন দশক ধরে ব্যাংকগুলো তাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের ওপরে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে,[৩৫] কিন্তু সেভাবে ব্যাংকিং সেবা উদ্ভাবন ও জনগণের কাছে তা পৌঁছাতে পানেনি।

সম্পদ সমাবেশ ঘটিয়ে তা নতুন বিনিয়োগের পথে চালিত করতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা খুবই দুর্বল। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে সাধারণত গ্রাহক সন্তুষ্টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায় না, কারণ সেগুলো প্রতিযোগিতার পীড়ন তেমন অনুভব করে না।[৩৬] বেশিরভাগ ইসলামী ব্যাংক তাদের নিজ নিজ অর্থনীতিতে একরকম প্রতিদ্বন্দ্বীহীন অবস্থায় কাজ করছে। তাই তারা নিজস্ব 'কমিটেড' গ্রাহকদের ওপর নির্ভর করে চলতে চায়।[৩৭]

---

৩৫ বিগত কয়েক বছরে প্রকাশিত বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের বার্ষিক ডাইরেক্টরি এবং ফুয়াদ এ. আল ওমর, *The Future of Islamic Banks Under Globalization of Economies*, (আরবি), ১৯৯৭ সালের ১০ নভেম্বর বাহরাইনে অনুষ্ঠিত "একবিংশ শতকের মুখোমুখি ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন" শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থাপিত নিবন্ধ।

৩৬ এর একটি ব্যতিক্রম হতে পারে বাহরাইন। সেখানকার ছোট্ট অর্থনৈতিক পরিবেশে তিনটি পুরোদস্তর এবং বেশ কয়েকটি বিদেশী ইসলামী ব্যাংক প্রতিযোগিতা করছে।

৩৭ জর্ডানে দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক এর তীব্র বিরোধিতা শুরু করে এবং নতুন ব্যাংকের কাছ থেকে গ্রাহকদের দূরে রাখতে সব ধরনের প্রপাগাণ্ডা চালায়। প্রচলিত ব্যাংকারদের পুঁজি নিয়ে আরেকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। সৌদি আরবে ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খোলার সময়ও একই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সাঈদ মারতান, *"Islamic Branches and Windows of conventional Banks: Experience of National Commercial Bank"*, এপ্রিল ২০-২৩, ১৯৯৮, কাসাব্লাংকায় "ইসলামী অর্থনীতির সমসাময়িক প্রয়োগ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত নিবন্ধ।

একটি ক্ষেত্রে একাধিপত্যমূলক চর্চা (monopolistic practice) লক্ষ্য করা যায়। আর তা হলো বিনিয়োগ ডিপোজিট এবং শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটির ওপর মুনাফার হারের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরকম পার্থক্য। যদিও লোকসানের দায়দায়িত্বের তুলনায় বিনিয়োগ ডিপোজিট ও শেয়ার ক্যাপিটাল এর মধ্যে পার্থক্য নগণ্য।[৩৮]

চলতি হিসাব নিয়ে প্রচলিত ব্যাংকের মতো একই ধরনের ফাঁদে পড়ে ইসলামী ব্যাংক। চলতি হিসাবকে ব্যাংকের ঋণ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর একটি অংশ বিনিয়োগ করা হয় এবং তা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডাররা ভোগ করেন। চলতি হিসাবের স্থিতি 'গ্রান্টেড'– এই যুক্তিতে কাজটিকে বৈধতা দেয়া হয়। মনে রাখতে হবে, বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশের প্রতিনিধিত্ব করে শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটি। এই চর্চা শেয়াহোল্ডারদের মুনাফা অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেয়। এ ব্যাপারে শরী'আহ্ বোর্ডের দেয়া বৈধতা এভাবে সহজেই খণ্ডন করা যায় যে, শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটি ইসলামী ব্যাংকের সম্পদের ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র।[৩৯] তাছাড়া, খেলাপির ক্ষেত্রে দায়দায়িত্বের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক যে গ্যারান্টি দেয় তার সঙ্গেও এটি তুলনীয় নয়। শেয়ারহোল্ডারদের ইকুইটি বিবেচনায় নিলে ওই ধরনের গ্যারান্টি অর্থহীন। তাছাড়া, চলতি হিসাবধারীদের মধ্যে ওই ধরনের হিসাব থেকে লাভের বদলে অর্থ তুলে নিতে পারার সুবিধা ভোগ করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ইসলামী ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ ডিপোজিট থেকে অর্থ তুলে নেয়ার ওপর কড়াকড়ি শিথিল করলে চলতি হিসাবধারীদের মনোভাবেও পরিবর্তন দেখা যাবে।[৪০] তাছাড়া, বিনিয়োগ ডিপোজিটের ওপর ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিধিনিষেধকে অত্যন্ত শোষণমূলক বলা যায়। বেশিরভাগ ইসলামী ব্যাংকে ডিপোজিট তহবিল সংযুক্তি কার্যকর হয় পরবর্তী মাসের শুরুতে, কিন্তু তহবিল তুলে নেয়া কার্যকর হয় চলতি মাসের শুরু থেকে। একটি ব্যাংক আবার ২৬৫,০০০ ডলারের নিচে বিনিয়োগ ডিপোজিট গ্রহণ করে না। এতে সকল ক্ষুদ্র আমানতকারী শূন্য-আয়ের চলতি হিসাব ব্যবস্থা ব্যবহার করতে বাধ্য হন। এর বিনিময়ে মাত্র ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পেইড-আপ ক্যাপিট্যালের মালিক শেয়ারহোল্ডাররা 'ডিমান্ড ডিপোজিট' বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি মুনাফা ভোগ করেন।

বিশেষ করে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর নতুন শাখা এবং সুসংহত মেগা-ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে আসন্ন তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে টিকে থাকার জন্য বর্তমান ইসলামী ব্যাংকগুলোর সামর্থ্য জোরদার করা একটি

---

৩৮ ১৯৯৮ সালের আগ পর্যন্ত বেশ কয়েক বছর বাহরাইনে ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক-এর শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফার হার ১৬%-এর ওপরে ছিল। অন্য দিকে বিনিয়োগ ডিপোজিটের মুনাফার হার ছিল ৪-৫% মাত্র।

৩৯ মনজের কাহ্ফ, *Profit Distribution in Islamic Banks,* রিভিউ অব ইসলামিক ইকনমিক স্টাডিজ, খণ্ড ৩, নং ২, ১৯৯৬, পৃ: ১১৩-১৪০ (আরবি)।

৪০ ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণত বিনিয়োগ ডিপোজিটের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ করে। মিসরের ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংকই একমাত্র ব্যাংক যে কিনা ২৪ ঘণ্টার নোটিশে বিনিয়োগ ডিপোজিট তুলে নেয়ার সুবিধা দেয়। এর ফলে, ব্যাংকটির স্থিতিপত্রে চলতি হিসাবের ঘরে নিম্ন স্থিতি এবং বিনিয়োগ হিসাবের ঘরে উচ্চ স্থিতি দেখা যায়। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের চেয়ে এটাই কেবল ব্যতিক্রম।

গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এ জন্য বিনিয়োগ ডিপোজিটহোল্ডার, কারেন্ট অ্যাকাউন্টহোল্ডার ও ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যবহারকারীদের জন্য ব্যাংকিং সেবা উন্নত করতে হবে।[৪১]

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবের বিষয়টি ফুটে ওঠে। যেসব দেশ পুরো ব্যাংকিং খাতের রূপান্তর ঘটিয়েছে সেগুলো ছাড়া বেশিরভাগ দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পর্ক মসৃণ নয়। এটা মূলত হচ্ছে জনবলের অক্ষমতার জন্য। এরা নিজেদের লেনদেনের ধরন সম্পর্কেও ভালোভাবে ওয়াকিবহাল নয়। ফলে তারা নিজেদের লেনদেনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাছে ভালোভাবে তুলে ধরতে পারেন না। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে অস্বস্তিকর সম্পর্কের মূল কারণ হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিশেষ আইন করা হয় তাতে এই 'বিশেষ ব্যাংকগুলোর' কাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্বাবধানের বিশেষত্বটি ভালোভাবে তুলে ধরা হয় না। বিভিন্ন সরকার যখন এসব আইন করে তখন তার কাছে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নের বিশেষ প্রকৃতির বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না।[৪২] কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো একই সঙ্গে এই নতুন প্রজাতির ব্যাংক ও ব্যাংকিং লেনদেনের সঙ্গে মানানসই নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু আদান-প্রদানের সমস্যা ছিল উভয়পক্ষেই। আজ পর্যন্ত কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকগুলোকে তত্ত্বাবধানের জন্য কোনো প্রমিত মান ঠিক করতে পারেনি। এমনকি মিসর ও কাতারের মতো যেসব দেশে বহু সংখ্যক ইসলামী ব্যাংক কাজ করছে সেখানেও এমন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এখনো ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকের মতো একই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে।[৪৩]

---

৪১ যেমন, নিউ ইয়র্কের সিটি ব্যাংক ১৯৯৫ সালে বাহরাইনে 'ইসলামিক সিটি ব্যাংক অব বাহরাইন' প্রতিষ্ঠা করে। সৌদি আরবের ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংক ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে ৪৬টির বেশি ইসলামী শাখা খোলে এবং ১৯৯৮ সালে পুরোদস্তর ইসলামী ব্যাংক 'আরব ব্যাংক অব জর্ডান' কার্যক্রম শুরু করে। ২০০০ সালে বাহরাইনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আরব ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং কর্পোরেশন'। এছাড়াও নিউইয়র্ক থেকে জেনেভা, কায়রো থেকে কুয়ালালামপুর পর্যন্ত প্রচলিত ধারার বহু ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং সেবা দান শুরু করেছে।

৪২ কুয়েতের পার্লামেন্টে কুয়েত ফিন্যান্স হাউজ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমর্থকদের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদের পেছনে এটাই ছিল মূল কারণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করেছিল কেএফএইচ-এর লেনদেন আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই সঠিক। অন্যপক্ষ এর প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ 'প্রিন্সলি ডিগ্রি'র দাবি করছিল।

৪৩ লুকা এরিকো এবং মিত্র ফারাহবাকাশ তাদের লেখা *Islamic Banking: Issues in Prudential Regulation and Supervision* (আইএমএফ কার্যপত্র নং ডব্লিউপি/৯৮/৩০)-এ ৮ শতাংশের বেশি মূলধন পর্যাপ্ততা (যা ওইসিডি দেশগুলোর জন্য ব্যাসেল কমিটির ন্যূনতম পর্যায়) রয়েছে এমন ব্যাংকগুলোতে ব্যাসেল কমিটির সিএএমইএল অনুসরণের পরামর্শ দেন। এ পরামর্শ গ্রহণ করা যায় না, কারণ তারা যে তাত্ত্বিক মডেল অনুসরণ করেছেন ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে তা মেলে না। ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদ মূলত ঋণ, অন্য দিকে এদের বেশিরভাগ দায় হলো বিনিয়োগ আমানত। এতে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় তাদের পুঁজির প্রয়োজনীয়তা হয় কম। এই যুক্তির পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় গাম্বিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুশীলন থেকে। সেখানে 'আরব গাম্বিয়ান ইসলামিক ব্যাংকে'র বিনিয়োগ আমানতকে তারল্য চাহিদা থেকে আলাদা রাখা হয়েছে (এজিআইবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে পাওয়া তথ্য)।

উপসংহার

ইসলামী অর্থায়ন ও আমানতের ধরনগুলোর টিকে থাকা ও অগ্রগতি ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ওপর নির্ভর করে না। ইসলামী অর্থায়ন রীতি ইতোমধ্যে মূলধারার ব্যাংকিং-এর সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত মূলত মুসলমানদেরকে এই ব্যাংকিং পদ্ধতি গ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে। অন্য দিকে, কিছু প্রচলিত ধারার ব্যাংক মিসর বা মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোতে ইসলামী শাখার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করলেও সেগুলো ছাড়া ইসলামী অর্থায়নের শেয়ার রীতি এখনো মূলধারার ডিপোজিট মার্কেটে প্রবেশ করতে পারেনি। তবে, এটা স্পষ্ট যে ইসলামী অর্থায়ন ও আমানত রীতি ব্যবহার কোনো প্রচলিত ব্যাংক থেকে সুদ বিলোপের অপরিহার্য শর্ত নয়। আল-গাজালির ভাষায় বলতে হয়, আমাদের 'তাহলিয়াহ্' ছাড়াও একটি 'তাকলিয়াহ্' প্রয়োজন যা প্রকৃত পণ্যবাজারের জন্য বোঝা সৃষ্টি করে এমন অর্থ সম্পদের স্তর হ্রাস বা বিলুপ্তি ঘটাবে। অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংকিং-এর সামষ্টিক-অর্থনৈতিক প্রভাব হাসিলের জন্য পুরো দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিবর্তন প্রয়োজন।[৪৪]

বিনিয়ন্ত্রণ ও বিশ্বায়নের চাপে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে। তবে তা ইসলামী অর্থায়ন নয়। যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংক কাজ করছে সেখানে তাদের নিজস্ব অবস্থান এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের পর্যায় থেকে উৎকর্ষ ও উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুবাদ : মাসুম বিল্লাহ

৪৪ রিশিডিউলিং, ডিসকাউন্টিং এবং হোলসেল ফিন্যান্সিং-এর ক্ষেত্রে পাকিস্তান, ইরান ও সুদানের ব্যাংকিং খাতের ইসলামীকরণের প্রভাব এবং তামাক ও অন্যান্য "অনৈতিক" উৎপাদন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কিভাবে অর্থায়ন সুবিধা দেয়া হয় তা নিয়ে গবেষণা মাস্টার্স থিসিসের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিষয় হতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. আনোয়ার, মোহাম্মদ, *Modelling Interest-Free Economy,* ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট, হার্নডেন, ভিএ, ১৯৯৭।

২. আল আমিন, হাসান আবদুল্লাহ, *al Wadai' al Masrafiyyah fi al Shari'a al Islamiyyah,* দার আল সুরুক, জেদ্দা ১৯৮০.

৩. বাহরাইন ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক, বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৫-১৯৯৭।

৪. ব্যাংক আর তাকওয়া, বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৮-২০০০।

৫. *al Wadai' al Masrafiyyah fi al Shari'a al Islamiyyah,* ১৯৯৬, বার্ষিক প্রতিবেদন, জেদ্দা, সৌদি আরব।

৬. হামুদ, সামি, *Modeling Banking Transaction in accordance with the Islamic Shari'ah,* (আরবি) লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, আম্মান, ১৯৭৬।

৭. ইকবাল, মুনাওয়ার, *Islamic and conventional bankimg in the nineties: a comparative study,* ইসলামিক ইকনমিক স্টাডিজ, খণ্ড ৮, নং ২, পৃঃ ১-২৭।

৮. ওআইসির ইসলামিক ফিকাহ্ একাডেমি, *Resolutions and Recommendations of the Islamic Fiqh Academy,* ১৯৮৫-১৯৯৭ সাল, আরবি, আইএফএ প্রকাশিত, ১৯৯৮, জেদ্দা।

৯. কাহ্ফ, মনজের, আল ইজারা আল মুনতাহিয়া বাই আল তামলিক [লিজিং থেকে মালিকানা], ২০০০ সালের ২২-২৮ সেপ্টেম্বর রিয়াদে অনুষ্ঠিত ওআইসি ফিকাহ্ একাডেমির ১২তম বার্ষিক সম্মেলনে এটি উপস্থাপন করা হয়।

১০. কাহ্ফ, মনজের, *Profit Distribution in Islamic Banks,* রিভিউ অফ ইসলামিক ইকনমিক স্টাডিজ, খণ্ড ৩, নং ২, ১৯৯৬, পৃঃ ১১৩-১৪০ (আরবি)।

১১. খান, এম. আলী, *Globalization of Financial Markets and Islamic Financial Institutions,* আইডিবিতে দেয়া বক্তব্য, জুন ৮, ১৯৯৮।

১২. খান, মোহসেন ও মিরাখোর, আব্বাস, *Monetary Management in an Islmaic Economy,* জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স, খণ্ড ১০, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

১৩. কুরান, তিমর, *Islamization and Economics: Policy Implication for a Free Society,* ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ অব কমপারেটিভ পাবলিক পলিসি, পৃঃ ৭১-১০২।

১৪. লুকা এরিকো এবং মিত্র ফারাহবাকাশ, *Islamic Banking: Issues in Prudential Regulation and Supervision,* আইএমএফ কার্যপত্র নং ডব্লিউপি/৯৮/৩০।

১৫. মিরাখোর, আব্বাস, *Progress and Challenges of Islamic Banking,* রিভিউ অব ইসলামিক ব্যাংকিং, খণ্ড ৪, নং ২, ১৯৭৭, পৃঃ ১-১১।

১৬. আল মুরতান, সাঈদ, *Transformation to Islamic Banking: the Experience of the NCB,* ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে কাসাব্লাংকায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সেমিনারে উপস্থাপিত।

১৭. আল ওমর, ফুয়াদ এ., *The Future of Islamic Banks Under Globalization of Economies,* অপ্রকাশিত নিবন্ধ, আইডিবি, জেদ্দা।

১৮. কুরাইশি, আনোয়ার, *Islam and the Theory of Interest,* আশরাফ পাবলিকেশন, লাহোর, ১৯৪৬।

১৯. আল সদর, মোহাম্মদ বাকের, *The Interest-Free Bank,* বৈরুত, ১৯৬০, (আরবি)।

২০. উজাইর, মোহাম্মদ, *An Outline of an Interestless Banking,* রাইহান পাবলিকেশন, করাচি, ১৯৫৫।

ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়নের প্রসারে শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের ভূমিকা

মুহাম্মদ ইরফান

সারসংক্ষেপ

ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়ন (আরএসএফ)-এর ইসলামী ধারণা হলো, দুই পক্ষ এখানে হাতে হাত রেখে ব্যবসায় যুক্ত হন। তারা প্রত্যাশিত লাভ বা লোকসানের জন্য সমানভাবে দায়ী থাকেন। এটা আধুনিক মানব ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে বিরাজমান সেই আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা থেকে আলাদা যা কেবল প্রভাবশালী ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ও শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে। এ নিবন্ধে ইসলামী আইনশাস্ত্রের আলোকে ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়ন ও শরী'আহ্র মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ দুয়ের সম্পর্ক গভীরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন শরী'আহ্ উপদেষ্টারা। সমকালীন আর্থিক কর্মকাণ্ডে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে এতে আলোচনা করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শরী'আহ্ উপদেষ্টারা কিভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভূমিকা রাখতে পারেন, তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে। যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এ নিবন্ধ লেখা এবং এর পাশাপাশি আরো যেসব বিষয় বিবেচনায় আনা যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে : ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে 'আরএসএফ' ও শরী'আহ্ উপদেষ্টা; সাধারণ স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং শরী'আহ্ উপদেষ্টারা কিভাবে ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়ন-এর উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। গবেষণাপত্রের প্রতিটি অংশের বক্তব্য সুদৃঢ় করতে প্রচুর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। শিরোনামের আলোকে এ নিবন্ধ তৈরিতে অনুসরণ করা হয়েছে গবেষণা পদ্ধতির বিশ্লেষণাত্মক রীতি।

সূচনা

জনগণের জীবনযাত্রার প্রয়োজন পূরণে আর্থিক ব্যবস্থা সবসময় হবে পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি এর প্রমাণ। সেসময় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র লন্ডন থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে স্থানান্তরিত হয়। তখন প্রভাবশালী বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় যুক্তরাষ্ট্র। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় ডলার। এর মাধ্যমে বৈশ্বিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব পরিচালিত হতে

মুহাম্মদ ইরফান : পাকিস্তানি সাংবাদিক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি করেন।

শুরু করে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধসে পড়ার পর ডলারের আধিপত্য চরমে পৌঁছে এবং এরপর শুরু হয় বর্তমান যুগ।

পরবর্তীকালে, ওয়াশিংটন বিভিন্ন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও সৌভাগ্যক্রমে বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়েনি। তবে একুশ শতকের শুরুতে আমেরিকানরা আফগান যুদ্ধ (২০০১) এবং ইরাক যুদ্ধের (২০০৩) মতো বিধ্বংসী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আমেরিকানদের এই আগ্রাসী দেশপ্রেম ডলারের মূল্য অনেক কমিয়ে দেয়। এ কারণে ডলারভিত্তিক বিশ্ব অর্থনীতিকে বেশ ভুগতে হয় এবং মুখোমুখি হতে হয় মন্দার। এটা ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক উভয়পর্যায়ে আঘাত হানে। এই বিপর্যয়ের কারণ ছিল সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মুখে যা 'চেইন-রিঅ্যাকশনে'র মতো কাজ করে। এই নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক মন্দার সবচেয়ে বড় শিকার হয় ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলো। আকস্মিক দুর্বিপাকে পড়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি টেকসই, শোষণহীন ও সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজে পেতে চিন্তাভাবনা শুরু করে।

এর পর থেকে বিশ্বজুড়ে অর্থনীতিবিদরা সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্দশা প্রশমনের জন্য গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে এমন বিকল্প অর্থব্যবস্থা তৈরির জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই অনুসন্ধান প্রচেষ্টা তাদেরকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসে। ইসলাম এমন এক জীবনবিধি যা মানবতার কল্যাণে নীতি ও আদর্শের পথ দেখায় এবং উন্নয়ন ঘটায় উৎকর্ষের। কুরআন ও সুন্নাহ'য় উল্লিখিত রীতিনীতি কখনোই বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়নি এবং কোনো যুগেই তা অপ্রাসঙ্গিক হয়নি। এসব রীতিনীতি সমাজকে সবসময় শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে গেছে। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই মানবতা ভয়াবহ বিপদ বা দুর্যোগে নিপতিত হয়েছে, তা থেকে পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করেছে কুরআনের বিধান। আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামের ঝুঁকিতে অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা গেলে বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

ইসলাম প্রবর্তিত 'আরএসএফ' ব্যবস্থা ব্যবসাক্ষেত্রে যৌথ প্রচেষ্টার ভিত্তি রচনা করে। এক্ষেত্রে ব্যবসায় লোকসান হলে উভয় পক্ষ যৌথভাবে সেই ক্ষতির তীব্রতা বহন করে এবং ব্যবসায় টিকে থাকতে সক্ষম হয়। তা নাহলে এক পক্ষকেই ক্ষতির পুরো বোঝা বহন করতে হয়। এভাবে 'আরএসএফ' ব্যবস্থা মানবকল্যাণে কাজ করে। এই গবেষণার বক্তব্য হলো: "আর্থিক কেন্দ্র এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের ভূমিকা 'আরএসএফ' ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে"। শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের নির্দিষ্ট প্লাটফর্মের আওতায় আনা গেলে তারা কিভাবে ঝুঁকিতে অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়নব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন এই প্রবন্ধে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে।

ঝুঁকিতে অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়ন ব্যবস্থা

বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষত পুঁজিবাদ ব্যক্তি ও বৃহৎ পরিসরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অসঙ্গতিকে উৎসাহিত করে। তাই এটা ধরে নেয়া যায় যে সুদ এক পক্ষকে লাভবান, আর

অন্য পক্ষকে করে ক্ষতিগ্রস্ত। এটি একান্তভাবে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। তাই সুদ এবং উসারিভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে ইসলামে শোষণমূলক বলা হয়েছে।

শোষণ ও অর্থনৈতিক অসমতা সৃষ্টি করে এমন যেকোনো পদ্ধতির নিন্দা করেছে ইসলাম। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ভালো করেই জানেন যে আর্থিক অসমতা সমাজে অস্থিরতা বাড়ায় এবং সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। আল-কুরআনে বর্ণিত অতুলনীয় নিয়ম হলো অর্থলোলুপতা ও অবৈধ উপায়ে অন্যের সম্পদ দখল সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা। এই নীতির আলোকে ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা যেসব গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়ঃ

ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রথম উদ্দেশ্য হলো সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিয়ে আসা। এটা কাউকে সীমা লঙ্ঘনের অনুমতি এবং কোনোভাবেই অন্যের সম্পদ জবরদখল করতে দেয় না। এটা অসদাচরণের সব সম্ভাব্য উপায় বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশ হলো, "অবৈধ উপায়ে একে অপরের ধনসম্পদ ভোগ করবে না" (২ঃ ১৮৮)।

কুরতুবি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এই আদেশে ছলচাতুরী, জুয়া, দখল, অন্যের অধিকার অস্বীকারের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। যে সম্পদ অনিচ্ছায় মালিক থেকে গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাও এর মধ্যে পড়বে।" নিষিদ্ধ অসদাচরণের মধ্যে সুদভিত্তিক ব্যবসা অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা হলো কোনো কিছুর ওপর অননুমোদিত সংযোজন গ্রহণ করা সুস্পষ্ট ভুল। তাই পবিত্র কুরআন একে নিরুৎসাহিত করেছে। তাছাড়া সুদ এড়িয়ে চলার পথটিও দেখিয়ে দেয় ইসলাম। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ আর সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন" (২ঃ ২৭৫)।

বিচারপতি মুহাম্মদ করম শাহ ব্যবসা ও সুদ-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করে এ দু'য়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এভাবে, "ব্যবসায় একজন মানুষ তার সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করেন। এতে তার মানসিক ও শারীরিক উভয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। এরপরও সে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করবে কি না তা অনিশ্চিত। অন্য দিকে সুদ-অন্বেষী (যে তার ভাইকে কেবল বাড়তি ও সঞ্চিত টাকা দেয়) পরিশ্রম করে না বা তার সময় ও সামর্থ্য ব্যবহার করে না। তাই এক্ষেত্রে তার নিরঙ্কুশ লাভের আশা করাও উচিত নয়।"[১]

ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি হলো দারিদ্র্য বিমোচন। আল-কুরআন তার অনুসারীদেরকে আর্থিকভাবে দুর্বল আত্মীয়স্বজন এবং সম্ভব হলে নৈতিক ও সহানুভূতির ভিত্তিতে অন্য মানুষের মধ্যেও সম্পদ বিতরণের আহ্বান জানায়। সুদকে ধিক্কার জানানো ছাড়াও পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে "সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুদ নিশ্চিহ্ন করেন এবং বৃদ্ধি করেন দানশীলতা" (২:২৭৬)।

এভাবে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির দাতব্য চেতনা অভাবী এবং দৈনন্দিন জীবন চালানো কষ্টকর এমন ব্যক্তিদের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করতে সাহায্য করে। একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি তার কোনো অভাবী ভাইকে আর্থিক বা অন্যকোনোভাবে সাহায্য করলে তাতে ওই ব্যক্তির দারিদ্র্য দূর হবে এবং তা শেষ

১ মুহাম্মদ করম শাহ, জিয়া-উল-কুরআন *(Zia-ul-Quran)*, খণ্ড ১, (লাহোর, জিয়া-উল-কুরআন প্রকাশনা, ১৯৯৫) পৃষ্ঠা-১৯৫।

পর্যন্ত পুরো সমাজের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে। তাই, দারিদ্র্য বিমোচনে দাতব্য কর্মকাণ্ড ও দান-খয়রাতের কথা বলে আল-কুরআন। এ লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন সমঅংশীদারিত্ব অথবা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমঝোতামূলক নীতির ভিত্তিতে ব্যবসার কথা বলে। আল-কুরআন সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা নিরুৎসাহিত করে বলছে "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা দ্বিগুণ বা চার গুণ সুদ খেও না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনন্ত সাফল্য পেতে পারো" (৩:১৩০)।

ইসলামী অর্থনীতির এ দুটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য মনে রাখলে বুঝা যাবে যে, ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়ন (আরএসএফ) ব্যবস্থাই সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক ভারসাম্য সৃষ্টির সঠিক উপায়। এই 'আরএসএফ' ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন অনেক পণ্ডিত।

এ ব্যবস্থার তাৎপর্য তুলে ধরে আব্বাস একে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: ঝুঁকিতে অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়নব্যবস্থায় শ্রম ও পুঁজির মধ্যে লাভ ভাগাভাগি হয়। পারিশ্রমিক পরিশোধের পর মুনাফা উদ্যোক্তা ও ইকুইটি মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যেহেতু লাভ প্রাক-উত্তর ঘটনা, তাই ইকুইটির আয়কে প্রাক-পূর্ব গণ্য করা যাবে না। এই ব্যবস্থায় অর্থায়ন ও বাস্তব অর্থনীতির মধ্যে 'ওয়ান-টু-ওয়ান' সম্পর্ক বিরাজ করে। ইকুইটিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পদ ও দায় দিয়ে 'স্টক' বিন্যাস করা হয় বলে এ ব্যবস্থা স্থিতিশীল থাকে। তাই এটি ব্যাংকিং সঙ্কট এবং পরিশোধপ্রক্রিয়ায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়া থেকেও মুক্ত।[২]

তার দৃষ্টিতে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় স্পষ্টত যে অবিচার রয়েছে ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থায় তা স্থান করে নেয়ার আশঙ্কা কম। মূলত ইকুইটিভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনায় উভয় পক্ষই আন্তরিকভাবে অবদান রাখেন। ব্যবসায় যেকোনো ক্ষতি হোক না কেন তারা তা ভাগ করে নিতে রাজি থাকেন। এভাবে দেখলে বুঝা যাবে পুরো পদ্ধতিটি স্থিতিশীল এবং তা বিশ্ব আর্থিকব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাহলে ব্যাংকিং সঙ্কট ও আর্থিক মন্দার মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে ২০০৭ সালে এর কবলে পড়েছিল বিশ্ব।

একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়ে আব্বাসের সঙ্গে হোসেনও একমত এবং তিনি বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য 'আরএসএফ' ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "ইসলামী ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সুস্পষ্ট মালিকানার অধিকার বজায় রাখেন। প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীতে এই বৈশিষ্ট্য ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে অধিকতর স্থিতিশীল করে তোলে।"[৩]

আসলে 'আরএসএফ' ব্যবস্থা হলো এমন কিছু নৈতিক নীতিবোধের সম্মিলন যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক কার্যক্রমে প্রয়োগ করা হয়। তাই এ পদ্ধতি অর্থনীতিতে এমন এক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে যা প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার পাশাপাশি মানুষের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

---

২ আব্বাস মিরাখোর, *Islamic Finance and Risk shring*, মাসিক নিউ হরাইজন, আগস্ট ২০১০,পাওয়া যাবে: *http://www.eurekahedge.com/news/*

৩ হোসেন আসকারি, *The Islamic Financial Szstem Alternative*, ওয়ার্ল্ড ফিনান্সিয়াল রিভিউ, ২০১১, পাওয়া যাবে: *http://www.worldfinancialreview.com/?p=533*, নেয়া হয়েছে জুলাই ২৩, ২০১৩।

ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার উপবিভাগ ইসলামী ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন সুন্দররাজন। তিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এর মৌলিক নীতিমালাও স্বীকার করেছেন। তার মতে, "ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলো কুরআন ও ইসলামী শরী'আহ্ আইনের আলোকে প্রণীত ও ইসলামী ধর্মীয় নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিব্যবস্থা এবং আর্থিক সেবা ও পণ্য।"[৪]

তবে একইসাথে তিনি বিনিয়োগকারীদের অধিকতর লাভের জন্য ইসলামী অর্থায়নে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত করার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, "ইসলামী ব্যাংকে কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত"।[৫]

অবশ্য তিনি ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগকারীদের লাভের সুযোগ ন্যূনতম হওয়ায় কিছুটা হতাশা প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি আসলে পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থ ও সুবিধাকে সমর্থন করেছেন। পুঁজিপতিদের পুঞ্জীভূত সম্পদ সমাজে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। তাই এখানে তার হতাশা অযৌক্তিক।

আব্বাস ইসলামী অর্থায়নকে সমর্থন করে বলেছেন, "ইকুইটি বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি শেয়ারিংয়ের ওপর জোর দিয়ে ইসলামী অর্থায়ন যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা একে সহজাতভাবে স্থিতিশীল করে তোলে"।[৬] যৌক্তিকতার নিরিখে, সুন্দররাজনের দৃষ্টিকোণ বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায় না এবং এটি পক্ষপাতদুষ্ট। একই সময়ে আব্বাস প্রচলিত অর্থব্যবস্থার সমালোচনা করেন এবং যুক্তি দেখিয়ে বলেন, "ঋণ ও সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থব্যবস্থা বার বার ভারসাম্যহীন বলে প্রমাণিত হচ্ছে"।[৭] আব্বাসের সাথে একমত হয়ে বলা যায়, ইসলামের 'আরএসএফ' ব্যবস্থা স্থিতিশীলতা আনতে পারে। তাই এর প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দিকে সুন্দররাজনের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। তিনি সেই পুঁজিবাদকে তুলে ধরেছেন যা আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। সুন্দররাজনের চাওয়া সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

শরী'আহ্ উপদেষ্টার ভূমিকা

আরবি শব্দ শরী'আহ্র শাব্দিক অর্থ জলপথ। তাত্ত্বিকভাবে, এটা ইসলামের এমন কতগুলো নীতি যা জীবনকে শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও শাশ্বত করে তোলে। একটি সূত্রে শরী'আহ্কে সংজ্ঞায়িত করা

৪ ভি. সুন্দররাজন, Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial Szstem: Key Issues in Risk Management and Challenges Ahead, আইএমএফ ওয়ার্কিং পেপার, নভেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা-৩, পাওয়া যাবে: http://books.google.com.pk/books?hl= en&lr=&id=9FtK7n6r_dwC&oi=fnd&pg=PA3&dq= risk+sharing+ finance+facility&ots =Dtl0JA9lw3&sig= CfxMccwitcbk51g6ZZgeswvqCr4#v= onepage&q= risk %20sharing%20finance%20 facility&f=false, নেয়া হয়েছে জুলাই ২৯, ২০১৩)

৫ প্রাগুক্ত।

৬ এম.আব্বাস মিরাখোর।

৭ প্রাগুক্ত।

হয়েছে এভাবে: "শরী'আহ্ শব্দের অর্থ হলো পানির উৎসে যাওয়ার রাস্তা" ।[৮] এ মত অনুসারে শরী'আহ্ হলো এমন এক বিজ্ঞান যার মধ্যে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত এবং এর অনুসারীদের প্রতিটি ক্ষেত্রে নীতি ও নৈতিকতা পরিপালনের নির্দেশ দেয় । আকরামের মতে : একজন মুসলমানের গোটা জীবন শরী'আহ্র আওতাভুক্ত । এতে তার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত বিশ্বাস, নৈতিকতা, গুণাবলি ও নীতিমালার দিকনির্দেশনা রয়েছে । এগুলো শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যই নয়, গোটা মানবতার জন্যও কল্যাণকর ।[৯]

শরী'আহ্র গুরুত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলছেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ করতে চান, যাতে তোমরা পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারো" (৫.৬) । পাশাপাশি আল্লাহ তার এই অনুগ্রহের পূর্ণাঙ্গতা পরকালে দিবেন বলেও জানিয়ে দিয়েছেন । একইভাবে এটা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে । পবিত্র কুরআনে এর প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে । "যদি তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চাও তাহলে ন্যায়বিচার কর, কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীকে পছন্দ করেন (৫:৪২) ।

কুরআনে নৈতিকতার বিধিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে । আর যে ব্যক্তিটি মানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাকে প্রশিক্ষণ দেয় শরী'আহ্ । এসব ব্যক্তির মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, দোভাষী, গবেষক, লেখক, সরকারি কর্মচারী, বক্তা এবং সেবাকর্মী । এদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন শরী'আহ্ উপদেষ্টারা । তারা সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামের আলোকে দিকনির্দেশনা দেন ।

ইসলামী অর্থনীতিতে বিশেষ কিছু নীতি আছে যেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে একজন উপদেষ্টা বুৎপত্তি লাভ করেন । যার ফলে তিনি ইসলামী বিধান সম্পর্কে অর্থনৈতিক সম্প্রদায়কে পরামর্শ দানের যোগ্য হন । আল-কুরআন এর অনুসারীদের দিকনির্দেশনা পেতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং বলেছে "তুমি যদি না জানো তাহলে যে জানে তার কাছ থেকে জেনে নাও" (২১: ৭) ।

এটা শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের গুরুত্ব তুলে ধরে । বিশেষ করে মানুষ যখন তার নিজের এবং বাকি মানবতার জীবন অর্থবহ করে তুলতে ইসলামের আলোকে দিক নির্দেশনা পেতে সচেষ্ট হয় । একইভাবে, শরী'আহ্ উপদেষ্টার গুরুত্ব মহানবী (সা.) এর হাদিসেও সুস্পষ্ট, "আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যাকে অনুগ্রহ দান করতে চান তাকে ধর্মের আত্মিকতা দিয়ে গড়ে তোলেন ।"[১০]

---

৮ শরী'আহ্ আইন, *Online News,* এপ্রিল ২০০৩, পাওয়া যাবে: *http://www.pbs.org/newshour/bb/africa/nigeria/sharia_law.html,* সেপ্টেম্বর ৪, ২০১৩ তারিখে নেয়া হয়েছে ।

৯ আকরাম লালদিন, *Maqasad Al-Shariah and the Foundational Requirements in Developing Islamic Banking and Finance,* ইসলামিক ফাইন্যান্স, আইএসআরএ ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ইসলামিক ফিন্যান্স, খণ্ড ৪, ইস্যু-১, পৃষ্ঠা–১৮৪ ।

১০ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি, সহিহ আল-বুখারি, খণ্ড ১, বই ৩, হাদিস নং ৭১ ।

ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়নের প্রসারে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে শরী'আহ্ উপদেষ্টাকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। প্রথমত, তাকে শরী'আহ্, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, আইনশাস্ত্রসহ ইসলামের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করে নিজের প্রাসঙ্গিকতার প্রমাণ দিতে হবে। তাকে ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার ওপর এমফিল ও পিএইচডি'র মতো উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনেও সচেষ্ট হতে হবে। এভাবে তিনি নিজের যোগ্যতার বাস্তব প্রয়োগ এবং ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়ন উন্নয়নের দায়িত্ব পরিপালনে সক্ষম হবেন।

দ্বিতীয়ত, এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রিধারীর মতো যোগ্য সিনিয়র ও জুনিয়র বিশেষজ্ঞরা ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়নের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের গবেষণা প্রকল্পগুলোতে যোগ দেবেন। এর মাধ্যমে তারা ইসলামী অর্থায়নের ওইসব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো জানতে পারবেন যেগুলো 'আরএসএফ'-এর উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

রিয়াজত বাটের মতে, শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে শরী'আহ্ উপদেষ্টা দু'ধরনের।[১১]

ক) প্রথমভাগে রয়েছেন গতানুগতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের ওপর স্নাতকরা। বর্তমানে ইসলামী বিজ্ঞান নিয়ে গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে ডিগ্রি দেয়া হয় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সমাজের দৈনন্দিন যেসব আর্থিক লেনদেন ঘটে সেগুলোসহ বৃহৎ পরিসরে অর্থনৈতিক বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট বই অন্তর্ভুক্ত। অর্থনীতির তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়নের বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে পড়ানো হয়। যেমন, ডিএমজি (দারুল উলুম মোহাম্মদিয়া গাউসিয়া ভেরা) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। এটি এমন এক প্রতিষ্ঠান যার পাঠ্যক্রমে রয়েছে অর্থনীতি। স্নাতক শিক্ষার্থীরা যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারেন সেজন্য ইসলামী ও পশ্চিমা অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এখানে পাশাপাশি শেখানো হয়। এ প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণের জন্য পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ অন্যান্য ইসলামী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১২] তাছাড়া ইমাম ইউসুফ, মুহাম্মদ আল গাজ্জালি, ইবনে রুশদ, শাহ ওয়ালীউল্লাহসহ সমসাময়িক অনেক পণ্ডিত ও মুসলিম অর্থনীতিবিদ সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং তাদের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এই প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

খ) দ্বিতীয়ভাগে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের মতো আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিতরা। এখান থেকে তারা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ হতে উঠতে পারেন। তারা ইসলামভিত্তিক অর্থনীতি বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবা দিতে পারেন।

---

১১ রিয়াজাত বাট, *Shariah Economist one of new Breed,* গার্ডিয়ান, মার্চ ১২, ২০০৮, পাওয়া যাবে: *http://www.theguardian.com/business/2008/mar/12/islamicfinance.islam.* ২৭ জুলাই, ২০১৩ তারিখে নেয়া হয়েছে।

১২ ডিএমজি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভেরা'র রেক্টর এর একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল নভেম্বর ২, ২০১৩ তারিখে, যেখানে তিনি ডিএমজি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

এই দুই বিভাগের মধ্যে অপ্রীতিকর দিকটি হল, একই বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন রকম। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদেরকে সম্মিলিতভাবে কাজ করা উচিত। তাহলেই তারা 'আরএসএফ' ব্যবস্থার উন্নয়নে আরো ভালোভাবে সেবা দিতে পারবেন।

শিক্ষাঙ্গন

শরী'আহ্ উপদেষ্টারা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় হলো প্রধান উৎস, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়ে সমাজে তার উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এস এম ব্রেজনিথ উল্লেখ করেন, "শিল্প বিপ্লবের কারণে সুযোগের যে বিস্তার ঘটে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরে অধিকতর প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে শুরু করেছে।"[১৩] দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ ব্যাপারে দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতি খুবই খারাপ এবং সরকার এখানে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে অনিচ্ছুক।

এটি সত্যিই দুঃখজনক বাস্তবতা। ব্রেজনিথ এর নিন্দা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য সরকারের প্রতি একনিষ্ঠ আগ্রহ নিয়ে এগুলোর পেছনে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।[১৪] মজার বিষয় হলো, একজন শিক্ষিত মানুষ তখনই গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হতে পারেন যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট একাডেমিক কোর্স সম্পন্ন করে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো উদার করেন। এ কারণেই ইউরোপ, উত্তর আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় অবদান রাখছে। তারা অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতি, প্রযুক্তি, এমনকি সামরিক ক্ষেত্রেও বিস্ময়করভাবে ভালো করছে।

সমাজে দক্ষ ও পারদর্শী মানুষ তৈরিতে পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে ভূমিকা রাখছে তা উপেক্ষা করা অন্যায় হবে। বিশ্বের প্রতিটি দেশকে তার নিজের উন্নয়নের জন্য উচ্চ শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। তাই, প্রতিটি জাতিকে অনিবার্যভাবেই ভালমানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হতে হবে। সেখানে ফলপ্রসূ গবেষণা হবে যা জাতির উন্নয়নে সহযোগিতা করবে।

এমতাবস্থায় নীতিনির্ধারকরা 'আরএসএফ' ব্যবস্থামুখী হতে চাইলে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উপযুক্ত মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভূমিকা রাখতে পারে দু'ভাবেঃ

---

১৩ সিরি এম ব্রেজনিথ, *The larger Role of Universities in economic development: Introduction to the Special Issue, Springer Science,* স্প্রিনজার সায়েন্স- বিজনেস মিডিয়া, জুলাই ১৭, ২০১০, পৃষ্ঠা ২, পাওয়া যাবেঃ *http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10961-010-9184-5#page-3,* থেকে আগস্ট ৩, ২০১৩ তারিখে নেয়া।

১৪ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৩।

১। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে গবেষক তৈরি করতে পারে। সেখানে আর্থিক ব্যবস্থাগুলোর শক্তিমত্তা ও ঘাটতি নিয়ে গবেষণা হবে। সেগুলো কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলো সুদমুক্ত করার উপায় বের করতে পারবেন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। যেসব বিষয়ে গবেষকদের অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে হবে সেগুলো হলো : ক) আর্থিক ব্যবস্থা কিভাবে সুদমুক্ত করা যায় তা খুঁজে বের করা, খ) যারা ব্যবসার উদ্যোগ নিয়েছেন তাদেরকে অর্থায়ন ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা দেয়া, এবং গ) উপদেষ্টারা পারেন সম্ভাব্য লাভজনক বিকল্পগুলো গ্রন্থিবদ্ধ করতে (ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ভাড়া করা বাদ দিতে হবে) যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ব্যবসাকে ইসলামী অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে উৎপাদনশীল করতে পারেন এবং অর্থায়নকারীর কাছে যেন সুদমুক্ত আসল টাকা ফেরত যায় তা নিশ্চিত হতে পারে।

২। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আওতায় সুনির্দিষ্ট বিভাগ খোলা। সেখানে 'আরএসএফ' ব্যবস্থার ওপর এমএসসি, এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণা করার ব্যবস্থা থাকবে। বিদ্যমান 'আরএসএফ' ব্যবস্থা উন্নত করার কৌশল ও পদ্ধতি বের করতে সহায়ক হবে এমন বিষয় বেছে নিতে হবে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণার জন্য। এ উদ্দেশ্যে গবেষণার জন্য নতুন বিভাগ ও গবেষণাক্ষেত্র স্থাপনের সুপারিশ করবে। এই মেধাবীদেরকে বিভিন্ন নীতিনির্ধারক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রণালয়গুলোতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

ব্যাংক

আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এমন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো ব্যাংক। শরী'আহ্ উপদেষ্টারা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেন। দুর্ভাগ্যবশত মুনাফা অর্জনের পথ হিসেবে বেশিরভাগ ব্যাংকই সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা অনুসরণ করে। ব্যবসার এই ধারণা ইসলাম অনুমোদিত আর্থিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বিপরীত। এরপরও ব্যাংকের নীতিপ্রণেতারা চাইলে ইসলাম নির্দেশিত 'আরএসএফ' ব্যবস্থার সূচনা করতে পারেন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে অনেক মুসলিম দেশ সেদিকে অগ্রসর হয়েছে। "পাকিস্তানের প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে শরী'আহ্ উপদেষ্টা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই শরী'আহ্ উপদেষ্টারা ৩ বছর পর পর পরিবর্তনযোগ্য। শরী'আহ্ উপদেষ্টা নিয়োগ হতে হয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'উপযুক্ত ও সঠিক মানদণ্ড' অনুসরণ করে"।[১৫]

এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটি সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে:

১৫ ডিএমজি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভেরা'র রেক্টরের একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল নভেম্বর ২, ২০১৩ তারিখে, যেখানে তিনি ডিএমজি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

প্রথমত, ওয়ার্কিং ব্যাংক সিস্টেম চালু করা যেতে পারে, যা 'আরএসএফ' কাঠামো তৈরিতে একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। এর আওতায় একটি উপবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে যেখানে শরী'আহ্ উপদেষ্টারা 'আরএসএফ' নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে পরামর্শকের কাজ করবেন।

দ্বিতীয়ত, ব্যাংকের মতোই কাজ করবে এমন একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা যেতে পারে। এটা ধনীদেরকে সুদবিহীন অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগের আহ্বান জানাবে এবং উদ্বুদ্ধ করবে। এভাবে নতুন প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলো ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারে এবং সেগুলো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই ধরনের ব্যবসায় যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। উপরোক্ত দু'ক্ষেত্রেই শরী'আহ্ উপদেষ্টারা 'আরএসএফ' প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

থিঙ্কট্যাঙ্ক

'আরএসএফ' ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর করতে 'থিঙ্কট্যাঙ্ক' হিসেবেও শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। 'থিঙ্কট্যাঙ্ক' হলো সমসাময়িক অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ গবেষণার প্রতিরূপ। বর্তমানে 'থিঙ্কট্যাঙ্ক' যে ভূমিকা পালন করছে তাকে মধ্যযুগের জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সাম্রাজ্য আমলের অভিজাত নীতিনির্ধারক ও উপদেষ্টাদের প্রতিরূপ হিসেবে বর্ণনা করা যায়। থিঙ্কট্যাঙ্ক-এর সাহায্যে মানবিক কর্মকাণ্ডের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি ও নীতিনির্ধারণী কার্যক্রমে গতি আনা যায়। অ্যান্ড্রো'র মতো থিঙ্কট্যাঙ্ক হলো :

একটি স্বাধীন, সুবিধামুক্ত, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা মূলত দক্ষতা ও ধারণার ওপর নির্ভর করে নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সমর্থন দান এবং একে প্রভাবিত করে।[১৬]

থিঙ্কট্যাঙ্ক-এর ভূমিকাকে জোসেফ বর্ণনা করেন এভাবে, "জননীতির বিভিন্ন পন্থা বিশ্লেষণ, এগুলো সম্পর্কে গবেষণা, ধারাভাষ্য প্রদান, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ব্যাপারে আলোচনা-এ সবই থিঙ্কট্যাঙ্ক-এর কাজের অন্তর্ভুক্ত"।[১৭] একথা ঠিক যে, থিঙ্কট্যাঙ্ক-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো গবেষণা ও বিশ্লেষণ, কিন্তু সেইসাথে তার কাজগুলোর প্রাসঙ্গিকতা অর্জন এবং তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়াও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপ, জাপান ও চীনসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো আর্থ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দ্রুততর করতে থিঙ্কট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর কাজ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, হংকং, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ভারত ও মালয়েশিয়ার মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোও একই পথ অনুসরণ করছে। বিভিন্নভাবে তারা থিঙ্কট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করছে। তাই আগামী দিনগুলোতে থিঙ্কট্যাঙ্ক-এর ভূমিকা জ্যামিতিক হারে বাড়বে বলে ধরে নেয়া যায়।

---

১৬ অ্যান্ড্রো রিচ, *Think Tanks, Public Policy and the Politics of Expertise,* কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪,: পৃষ্ঠা ১১।

১৭ জোসেফ জি লেহম্যান, *The Role of Think Tanks,* লিবার্টি গাইড, অক্টোবর ১৮, ২০১২, *http://www.libertyguide.com/resources/2-the-role-of-the-think-tank* থেকে আগস্ট ৪, ২০১৩ তারিখে নেয়া হয়েছে।

অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাজীবীদের থিঙ্কট্যাঙ্ক-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে সহায়তা করতে পারেন। তারা শাসনকাজ পরিচালনা এবং এর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন: অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিকাশের জন্য অত্যন্ত কার্যকর পরামর্শ দেন। তাই, 'আরএসএফ' ব্যবস্থার উন্নয়নে শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য 'থিঙ্কট্যাঙ্ক' হতে পারে একটি প্ল্যাটফর্ম, যা কাঙ্ক্ষিত প্রচেষ্টাকে বাস্তবে পরিণত করবে।

থিঙ্কট্যাঙ্ক-এ শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য নিম্নোক্ত পথ অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রথ মত, অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঝুঁকিতে অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়নব্যবস্থার উপযোগী করে নতুনভাবে সাজানো। দ্বিতীয়ত, 'আরএসএফ' ব্যবস্থার ওপর তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা করবে এমন নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি। তাহলে এসব প্রতিষ্ঠানে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের সুযোগ পাবেন শরী'আহ্ উপদেষ্টারা। তৃতীয়ত, নতুন প্রতিষ্ঠিত নীতি-প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় কমাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আগে থেকেই কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিকল্প বিভাগ চালু করা যেতে পারে। এসব উপায় অনুসরণ করে শরী'আহ্ উপদেষ্টারা অত্যন্ত কার্যকরভাবে থিঙ্কট্যাঙ্ক-এ যুক্ত হতে পারেন এবং 'আরএসএফ' ব্যবস্থার উন্নয়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়

ওপরে প্রাতিষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তির যে কথা বলা হয়েছে সে লক্ষ্যে ঝুঁকি শেয়ারমূলক অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের পরামর্শক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়। একটি রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা তার সার্বভৌম ক্ষমতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। পিসি জেইন দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে বলেন "জনপ্রশাসন এবং এর সাথে সম্পর্কিত অর্থ-প্রশাসনসহ অন্যান্য বিভাগের আয়-ব্যয় নিয়ে 'জাতীয় অর্থব্যবস্থা' কাজ করে।"[১৮] জাপান থেকে চিলি এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে কানাডা পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কোনো-না-কোনোভাবে একটি স্বশাসিত অর্থ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার তত্ত্বাবধানে থাকেন একজন সিনিয়র মন্ত্রী। এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি ও উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করা হয়।

একটি সম্পদসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পাকিস্তানের সামনে একটি অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বলিষ্ঠ ও পরিণামদর্শী অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করা এবং অর্থনৈতিক ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই অর্থ মন্ত্রণালয় গঠন করে পাকিস্তান। এ মন্ত্রণালয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে 'আরএসএফ' এবং অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করতে পারে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়কে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে পারে। পাকিস্তানের ইসলামী ব্যাংকিং খাত পর্যালোচনা রিপোর্ট অনুযায়ী, "অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে তারল্য ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ

১৮ পিসি জেইন, *Economics of Public Finance*, নতুন দিল্লি: আটলান্টিক পাবলিশার্স, ১৯৮৯,পৃষ্ঠা-২।

করা হয় । প্রাথমিক পর্যায়ে মন্ত্রণালয় গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান ও সবধরনের প্রযুক্তিগত ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ জোগান দেয় পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক ।[১৯] একইভাবে, সরকারকে বুঝিয়ে মন্ত্রণালয়ে এমন একটি বিভাগ চালু করা যেতে পারে যেখানে শরী'আহ্ উপদেষ্টারা তাদের জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের সুযোগ পাবেন । মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্বেও শরী'আহ্ উপদেষ্টাদেরকে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে ।

'আরএসএফ' ব্যবস্থার গতিশীলতা নিয়ে গবেষণার জন্য শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে । নির্বাচিত করা যেতে পারে সরকারপ্রধানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে । উপরন্তু, 'আরএসএফ' ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কামিটিগুলোতে সদস্য হিসেবে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । এ ছাড়াও শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের কাছ থেকে পছন্দমতো যেকোনো সেবা নিতে পারে মন্ত্রণালয় । এসব সেবার মধ্যে থাকতে পারে:

ক) মন্ত্রণালয় 'আরএসএফ' ব্যবস্থার ছাত্রদের জন্য ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি নিতে পারে । এই প্রক্রিয়ায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে ।

খ) ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থা, বিশেষ করে 'আরএসএফ' ব্যবস্থার গুরুত্ব ও সম্ভবপরতা বিষয়ে সেমিনার ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা যেতে পারে । এসব সেমিনার ও সম্মেলনে অংশ নিতে শিক্ষাবিদদের প্রতি আহ্বান জানানো হবে । যেসব স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে 'আরএসএফ' ব্যবস্থার জন্য কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে পারে অর্থ মন্ত্রণালয় ।

গ) এছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয় 'আরএসএফ' বিশেষজ্ঞদের সেবা পেতে সরাসরি তাদেরকে নিযুক্ত করতে পারে ।

আরএসএফ নেটওয়ার্কিং

আর্থিক ব্যবস্থা, বিশেষ করে ঝুঁকি শেয়ারমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে 'আরএসএফ নেটওয়ার্কিং' অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হতে পারে । উদ্ভাবনে নতুনত্ব আনা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে 'নেটওয়ার্ক রিলেশনশিপ' । লুক ও ম্যাক্সিন মনে করেন, "যোগানদার, গ্রাহক এবং পেশাজীবী ও বণিক সমিতির মতো মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে 'নেটওয়ার্ক রিলেশনশিপ' এমন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক যা উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে ।"[২০]

---

১৯ ইসলামী ব্যাংকিং বিভাগের তৈরি পাকিস্তানের ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর পর্যালোচনা, ২০০৩-২০০৭; পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক, পৃষ্ঠা ৫৮, *http://www.sbp.org.pk/ibd/Islamic-Bkg-Review-03-07.pdf* থেকে নভেম্বর ১৫, ২০১৩ তারিখে নেয়া ।

২০ লুক পিট্টাওয়ে এবং ম্যাক্সিন রবার্টসন, *Networking and innovation: A Szstematic review of the Evidence,* ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ম্যানেজমেন্ট রিভিউ, খণ্ড ৫, ইস্যু ৩-৪, সেপ্টেম্বর ২০০৪, *http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-8545.2004.00101.x/abstract;jsessionid=E05372979BA83E0007BB5A5DA2B8237D.f01t03?denied%20AccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false* থেকে নভেম্বর ২৩, ২০১৩ তারিখে নেয়া ।

তাই 'আরএসএফ' প্রাসঙ্গিক করে তুলতে প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে 'আরএসএফ নেটওয়ার্কিং' সংগঠিত করা উচিত। মুসলিম দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ শহরে 'আরএসএফ নেটওয়ার্কিং'-এর আঞ্চলিক অফিস খুলতে হবে। জোনাল ও রিজিওনাল অফিসের মাধ্যমে 'আরএসএফ নেটওয়ার্কিং' যেসব কাজ করতে পারে:

- যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মতো 'আরএসএফ নেটওয়ার্কিং' ধনী ব্যক্তি ও সংস্থা থেকে টাকা সংগ্রহ করে উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীদের ধার দিতে পারে। যেখানে অর্থ ফেরত পাওয়ার সময় অর্থদাতা কোনো সুদ পাবেন না। খ) এটি তাদেরকে লাভক্ষতির অংশীদারিত্ব ভিত্তিতে ব্যবসায় অংশ নিতে রাজি করাতে পারে। গ) এটি নিজেও কোনো ব্যবসা শুরু করতে পারে এবং সম-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাতে অংশগ্রহণের জন্য বিত্তবানদের রাজি করাতে পারে।

- তাছাড়া, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় 'আরএসএফ' বিষয়ে গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য মেধাবীদের ভর্তি ও তাদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করবে সেগুলোকে সহায়তা দিতে পারে এই নেটওয়ার্ক। অধিকন্তু, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়া শরী'আহ্ উপদেষ্টারা যেন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন সেজন্য এটি তার প্রভাব কাজে লাগাতে পারে।

- 'আরএসএফ' ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাংকের মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেবে এটি।

- এটি থিঙ্কট্যাঙ্ক-এর সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের গবেষণা প্রকল্প, আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলন আয়োজনে আর্থিক সহায়তা দিতে পারে।

উপসংহার

ইসলাম অবশ্যই প্রতিটি মানুষের জন্য একটি স্থিতিশীল জীবন নিশ্চিত করতে চায়, যা শুধু তার জন্যই নয় গোটা সমাজের জন্য হবে কল্যাণকর। ইসলামী অর্থায়ন সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে আর্থিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করে, যা শেষ পর্যন্ত সমাজকে স্থিতিশীল অবস্থার দিকে নিয়ে যায়। সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এই 'আরএসএফ' ব্যবস্থা হলো ইসলামী অর্থনীতির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইতোপূর্বে উল্লিখিত দুই শ্রেণীর শরী'আহ্ উপদেষ্টারা সমকালীন তত্ত্ব এবং পূর্বসূরি মনীষী ও গবেষকদের রেখে যাওয়া অর্থনৈতিক ধারণা সম্পর্কে অবগত হতে পারলে তা তাদের জন্য শুভ ফল বয়ে আনবে। সুনির্দিষ্টভাবে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা প্রকল্প চালু করা উচিত। সেমিনার ও সম্মেলনের মাধ্যমে সমসাময়িক অর্থনৈতিক ইস্যুগুলো তুলে ধরাও ফলপ্রসূ হতে পারে। সমসাময়িক এবং গতানুগতিক তত্ত্ব ও ধারণাগুলোর সঙ্গে উপদেষ্টাদের পরিচয় করিয়ে দিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু সুনির্দিষ্ট কোর্স চালু করা উচিত। এতে 'আরএসএফ' ব্যবস্থার প্রসারে আরো ভালোভাবে ভূমিকা রাখতে পারবেন শরী'আহ্ উপদেষ্টারা।

এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'থিঙ্কট্যাঙ্ক' ও 'আরএসএফ নেটওয়ার্কিং' পরিচালিত হতে পারে। পক্ষান্তরে সরকারি খাতের অংশ হিসেবে ব্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের মতো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্বে বর্ণিত উপায়ে শরী'আহ্ উপদেষ্টাদের কাজে লাগোতে পারে। 'আরএসএফ'-এর উন্নয়নে সহায়ক হবে এসব উদ্যোগ। এ লক্ষ্যে এমন এক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য যা বিশ্বব্যাপী সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অর্থনৈতিক কেন্দ্রে সাব-অফিস স্থাপনের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবে।

এই প্রক্রিয়া জাতীয় অর্থনীতির প্রাসঙ্গিক অংশ হিসেবে 'আরএসএফ'-কে এগিয়ে নিতে সরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ধনী ব্যক্তি এবং এমনকি সরকারকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এটি 'আরএসএফ প্রসারে'র অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল। পরিশেষে বলা যায় উল্লিখিত পরামর্শগুলো কার্যকরভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হলে ঝুঁকিতে অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়ন ব্যবস্থার প্রসারে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে পারবেন শরী'আহ্ উপদেষ্টারা।

অনুবাদ : শাদমান সাকিব

তথ্যপঞ্জি

গ্রন্থ

আল-কুরআন

অ্যালেন, ফ্রাঙ্কলিন; *Financial Innovation and Risk Sharing;* এমআইটি প্রেস, ১৯৯৪।

বিন ইসমাইল, মোহাম্মদ, বুখারি। সহিহ আল-বুখারি, খণ্ড ১, বই ৩, হাদিস নং ৭১।

ইকবাল, মনোয়ার; *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk;* এডোয়ার্ড এলগার পাবলিশিং, ২০০২।

জৈন, সি, পি; *Economics of Public Finance;* নয়াদিল্লি, আটলান্টিক পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

খান, ফেইসেল; *Islamic Economics;* নিউইয়র্ক, পালগ্রেভ ম্যাকমিলান (২০১১)।

ম্যাসেসিস, জর্জ; *Issues in Money and Banking;* ওয়েস্টপোর্ট সিটি; প্রেজার পাবলিশার্স, ২০০০।

রিচ, অ্যান্ড্রু; *Think Tanks, Public Policy and the Politics of Expertise;* ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ক্যামব্রিজ, ২০০৪।

শাহ, করিম, মোহাম্মদ; জিয়া-উল-কুরআন, খণ্ড ১, লাহোর। জিয়া-উল-কুরআন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫।

জার্নাল

হাসান, এম. কবির; *A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking*

ফিনান্সিয়াল মার্কেটস, ইন্সটিটিউশন্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টস, খণ্ড ১০; পৃঃ ১৫৫-১৯৯ ।

লালদিন, আকরাম, *Maqasad Al-Shariah and the Foundational Requirements in Developing Islamic Banking and Finance;*

আইএসআরএ, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ফিন্যান্স । খণ্ড ৪, ইস্যু ১, পৃঃ ১৮৪ ।

স্টুলজ, রেনে এম; *Globalization, Corporate Finance and the Cost of Capital;* জার্নাল অব অ্যাপ্লাইড কর্পোরেট ফিন্যান্স, খণ্ড ১২, ১৯৯৯ ।

সুন্দররাজন, ভি; *Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial Sztem: Key Issues in Risk Management and Challenges Ahead;* আইএমএফ ওয়ার্কিং পেপার, নভেম্বর ২০০২, পৃঃ ৩ ।

ম্যাগাজিন

ব্রেজনিথ, এম, শিরি; *The larger Role of Universities in economic development: Introduction to the Special Issue;* স্প্রিঞ্জার সায়েন্স-বিজনেস মিডিয়া; জুলাই ২০১০ ।

ভাট, রিয়াজাত; *Shariah Economist one of new Breed;* দি গার্ডিয়ান, মার্চ ১২, ২০০৮ ।

পত্রিকা

Emergence of Shariah Law. Online News (Islamabad), এপ্রিল ২০০৩ ।

ব্যক্তি

আমিন-উল হাসনাত মোহাম্মদ, শাহ । রেক্টর, ডিজিএম ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ও মিনিস্টার অব স্টেট । অক্টোবর ১৪, ২০১৩ ।

ইন্টারনেট

আসকারি, হোসাইন: *The Islamic Financial Szstem Alternative. The World Financial Review. 2011. http://www.worldfinancialreview.com/?p=533,*

কার্লাসারি, এলিজাবেথ: *How banks make money;* দি স্ট্রিট, অক্টোবর ২০০৭ । *http://www.thestreet.com/story/10385783/how-banks-make-money.html*.

ইকবাল, জামির; *Islamic Financial Szstem. http://www.melafrit.com/education/Finance/FinanceIslamique/documents/Islamic_Finance_Szstem.pdf.*

লেহম্যান, জোসেফ জি; *The Role of Think Tanks. Liberty Guide. October 18, 2012. http://www.libertyguide.com/resources/2-the-role-of-the-think-tank/,*

মিরাখোর, আব্বাস; . *Islamic Finance and Risk Sharing, Hedge Fund Monthly-New Horizon. August 2010, http://www.eurekahedge.com/news/10_Aug_NewHorizon_Risk_Sharing_and_Islamic_Finance.asp,*

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং : সক্ষমতা ও সম্ভাবনার নিরিখে

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

১. ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকিং একটি নতুন ধারা। প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার নানা প্রতিকূলতা ও মন্দা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সময়ে শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংকিং বার্ষিক ১৮ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি নিয়ে তার সামর্থ্য ও দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী পাঁচ শতাধিক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা আগামী পাঁচ বছরে পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ। এদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যাত্রা শুরু হয় তিন দশক আগে। এই ব্যাংকিং পদ্ধতি বর্তমানে দেশের মোট ব্যাংকিং-এর এক-পঞ্চমাংশ ধারণ করছে।

সম্পদমূল্যের (size of assets) ভিত্তিতে বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং-এ বাংলাদেশের অবস্থান দশম। 'সম্পদের আকৃতি'র বদলে 'বণ্টনের প্রকৃতি' তথা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিবেচনায় বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অবস্থান তারচেয়ে অনেক ভালো।

পৃথিবীজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ৩৮ মিলিয়ন গ্রাহকের মধ্যে ১৩ মিলিয়ন বা ৩৫ শতাংশ গ্রাহক একক্ভাবে বাংলাদেশের। এছাড়া বৈশ্বিক ইসলামী ক্ষুদ্রঋণের ৫০ শতাংশই ধারণ করছে বাংলাদেশের বৃহত্তম শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংকটি।

দারিদ্র্য বিমোচন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখছে। এ পদ্ধতির জনচাহিদা ও বাজার অংশীদারিত্ব উত্তরোত্তর বাড়ছে।

১৮ শতাংশ বাজার শেয়ার নিয়ে মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং দুনিয়াব্যাপী শরী'আহ্ ব্যাংকিং-এর অন্যতম কেন্দ্রভূমির (Hub) মর্যাদা পেয়েছে। সীমিত কিছু ইসলামী ব্যাংকিং প্রোডাক্ট নিয়ে নিছক আর্থিক নীতিমালা সহজীকরণের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুর ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উদীয়মান বাজার আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

দেশের এক-পঞ্চমাংশের বেশি মার্কেট শেয়ার, বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং গ্রাহকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার এবং বিশ্বের ইসলামী ক্ষুদ্রঋণের পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ার নিয়ে উপযুক্ত নেতৃত্ব, প্রণোদনা ও যথাযথ ব্রান্ডিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হতে পারে।

২. দ্রুত বিকাশমান আর্থিক ধারা

ইসলামী ব্যাংকিং বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ছিল গবেষণার বিষয়। এ ব্যবস্থা ছিল দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের রচনাবলির মধ্যে সীমিত। ষাটের দশকে এ নিয়ে বাস্তবধর্মী পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। সত্তরের দশকে তা বৃহত্তর পরিসরে ও আঙ্গিকে দিকনির্দেশনা লাভ করে। আশি ও নব্বই-এর দশকে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি আরো সুসংহত হয়। একুশ শতকে ইসলামী ব্যাংকিং আধুনিক বিশ্বে কল্যাণমুখী টেকসই ব্যাংকিং ধারা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

বিগত দশকগুলোতে ইসলামী অর্থায়নপদ্ধতি প্রতিযোগিতাময় বৈশ্বিক আর্থিক পরিমণ্ডলে তার যোগ্যতা ও সক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও নানা টানাপড়েনের মাঝেও এ ব্যবস্থা টিকে থাকার বিশেষ সামর্থ্য দেখিয়েছে। ইসলামী পদ্ধতির এই সক্ষমতা বিশ্বের আর্থিক বিশ্লেষক ও চিন্তাবিদদের দৃষ্টি আর্কষণ করেছে।

একুশ শতকে ইসলামী ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সার্বিক ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুরস মন্তব্য করেছে: 'ইসলামী ব্যাংকিং ইতোমধ্যে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার প্রকৃত বিকল্প হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। মূলত চলমান বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত প্রচলিত অর্থায়নপদ্ধতির যোগ্যতার বিকল্প হিসেবে ইসলামী অর্থায়ন শিল্প আত্মপ্রকাশ করেছে।'

৩. ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলদর্শন

ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামের বণ্টনমূলক সুবিচারভিত্তিক সুষম অর্থনৈতিক নীতি-আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে। আর্থিক মধ্যস্থতার এই বিশেষ পদ্ধতি লেনদেনে সুদ গ্রহণ বা প্রদান না করে লেনদেনের সর্বজনবিদিত স্বাভাবিক ও সহজাত পদ্ধতি অনুসরণ এবং সেই সাথে ইসলামী অর্থনীতির ন্যায়বিচারমূলক উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়। এই পদ্ধতির ব্যাংকগুলো বৈষম্য দূরীকরণ, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থসামাজিক অবকাঠামো তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামীব্যবস্থায় টাকার কৃত্রিম লেনদেনের পরিবর্তে পণ্য বেচাকেনা, ইজারা বা ভাড়া এবং অংশীদারি কারবারের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সুদমুক্ত লেনদেনের এ স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়াও এই ব্যাংকব্যবস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মধারায় কল্যাণধর্মী ও বণ্টনমূলক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা অপরিহার্য। এভাবেই ইসলামী ব্যাংক আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থের উপর সামাজিক কল্যাণের আদর্শ প্রাধান্য পায়।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গুটিকতক মানুষের লোভের (Greed) চাহিদা পূরণে কাজ করে না। সব কিছুর ওপর নিছক আর্থিক লাভকে প্রাধান্য দেয় না। সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা (Need) পূরণে তাদের জরুরি প্রয়োজন, স্বাচ্ছন্দ্যমূলক প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যবর্ধনমূলক প্রয়োজনের মধ্যে ক্রম অগ্রাধিকারের নীতি মান্য করে এ ব্যাংক তার বিনিয়োগ পোর্টফোলিও রূপায়ণ করে। এটা এ ব্যবস্থার বিশেষ কর্মকৌশল এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী নৈতিক শৃঙ্খলার দাবি। এভাবে ইসলামী ব্যাংক সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয়সাধন করে।

আর্থিক লেনদেনে প্রকৃত পণ্যের (Real Asset) কারবার এবং দরদভিত্তিক মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাংকবহির্ভূত বঞ্চিত ও অভাবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন ইসলামী ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বাধ্যবাধকতা।

ইসলামী ব্যাংকিং কল্যাণধর্মী ও উৎপাদনমুখী ব্যবস্থারূপে সম্পদ উৎপাদনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। সেই সাথে কী ধরনের সম্পদ কার জন্য উৎপাদিত হবে এবং সেই উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন নীতি কী হবে এটাও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের কারণ দূরীকরণ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে। গ্রাহকদের সাথে দাতা-গ্রহীতার বদলে অংশীদারিত্বের সম্পর্কের নীতি অনুসরণের ফলে এ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমে প্রকৃত কল্যাণকামিতার গুণগত ও ইতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট হয়।

৪. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিকাশ

৪.১ ব্যক্তি উদ্যোগ

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের পর পূর্ব বাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে নতুন গতিসঞ্চার হয়। এ সময় বাংলাদেশের যশোর ও কক্সবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে সে উদ্যোগ স্থায়ী ভিত্তি পায়নি।

পরবর্তীতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। তবে শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সে প্রত্যাশা বহুদিন অপূর্ণ থেকে যায়।

৪.২ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

স্বাধীনতার পর এ দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় নানামুখী তৎপরতা শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করে। এই সনদ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সদস্যদেশগুলো নিজ দেশের ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী নীতিমালার আলোকে পর্যায়ক্রমে পুনর্গঠনের অঙ্গীকার করে।

১৯৭৮ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে ওআইসি দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়। এছাড়া সদস্যদেশগুলো নিজ নিজ দেশের ব্যাংকব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরের সুপারিশ অনুমোদন করে। বাংলাদেশ এসব সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় এবং এ সুপারিশের অংশীদার হয়।

৪.৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রণী ভূমিকা

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শুরু থেকেই অত্যন্ত সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯৮১ সালের ৪ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংককে লেখা চিঠিতে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সব ব্যাংকের শহর ও গ্রামপর্যায়ের সব শাখায় পরীক্ষামূলকভাবে পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্টার চালু ও পৃথক লেজার সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়।

১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে গবেষণা পরিচালক এ এস এম ফখরুল আহসানকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। তিনি ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ সংবলিত একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

এরপর ১৯৮১ সালের ১৮-১৯ মার্চ বিআইবিএম-এর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে দু'দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে এ সেমিনার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম ডেপুটি গভর্নর এম. খালিদ খান। সেমিনারে সরকারি-বেসরকারি উভয়পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।

১৯৮১ সালের ৯-১১ জুন সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ইসলামী ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অংশ নেন।

১৯৮২ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৪তম ব্যাংকার্স সভায় তৎকালীন গভর্নর নূরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে দেশের তখনকার ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দু'টি বিশেষায়িত ব্যাংকের মেট্রোপলিটন ও জেলা সদর শাখাগুলোতে অবিলম্বে ইসলামী ব্যাংকিং চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সিদ্ধান্তের আলোকে ইসলামী ব্যাংক পরিচালনার উপযোগী জনশক্তি তৈরির জন্য ১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর এক মাসব্যাপী এক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিআইবিএম ও প্রস্তাবিত 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড' (বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড)-এর ৩৭ জন কর্মকর্তা এ কোর্সে অংশ নেন।

সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল এম. আযীযুল হক এ কোর্সের সফল বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। এ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পূবালী ব্যাংকের

তৎকালীন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব এম খালেদ। এ ট্রেনিং চলাকালেই জনাব এম খালেদ বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত হন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে তিনি উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন।

৪.৪ অন্যান্য উদ্যোগ

১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক কাজে অংশ নেয়। এ সময় জনাব এম. খালেদের নেতৃত্বে ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামী ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ গঠিত হয়। পরে এই ওয়ার্কিং গ্রুপ তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (বিআইবিএ) নামে পুনর্গঠিত হয়।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দেশের উর্ধ্বতন ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদসহ পেশাজীবীদের নিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বেশ ক'টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে। এ সময়ের মধ্যে তিন শতাধিক ব্যাংক কর্মকর্তা ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন।

৪.৫ বাস্তব রূপায়ণ

দেশের বেশ ক'জন ব্যক্তি উদ্যোক্তার পাশাপাশি ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)-সহ বিদেশী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার হাত বাড়ায়। আইডিবির সক্রিয় উদ্যোগের কারণে কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, লুক্সেমবার্গের ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন, সৌদি আরবের আল-রাজি কোম্পানি ফর কারেন্সি এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কমার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং কুয়েতের তিনটি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের এই প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সত্তর ভাগ মূলধন জোগান দেয়।

বাংলাদেশ সরকারের পাঁচ ভাগ মূলধনসহ অবশিষ্ট মূলধন আসে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে। ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' নিবন্ধিত হয় এবং সে বছর ৩০ মার্চ থেকে কাজ শুরু করে।

দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটির সফল কার্যক্রমের পথ ধরে পরে দেশে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে আল বারাকা ব্যাংক, ১৯৯৫ সালে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক ও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, ২০০১ সালে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০৪ সালের ১ জুলাই থেকে এক্সিম ব্যাংক এবং ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক তাদের কার্যক্রম ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে।

২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শরী'আহ্ভিত্তিক 'ইউনিয়ন ব্যাংক'।

৫ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিচালনগত সাফল্য

১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংকের উদ্বোধন উপলক্ষে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড. এম এন হুদা মন্তব্য করেন, 'ইসলামী ব্যাংকিং তাত্ত্বিক পর্যায়ে জয়ী হয়েছে। এখন এ পদ্ধতিটিকে পরিচালনগত কার্যক্রমে জয়ী হতে হবে...'।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের তিন দশক পেরিয়ে এসে এখন আমরা ফিরে দেখছি সে প্রত্যাশা পূরণে এ পদ্ধতি কতটা সফল হয়েছে।

৫.১ উদ্দেশ্যভিত্তিক অর্জন

ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রমে সার্বজনীন কল্যাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও সুষম বণ্টনকে গুরুত্ব দেয়। এ কারণে প্রচলিত আর্থিক সূচকের পরিবর্তে উদ্দেশ্য অর্জনের মাপকাঠিতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সফলতা নিরূপণ অধিকতর যুক্তিযুক্ত। শুধু সম্পদমূল্য বা মুনাফা বিবেচনার প্রচলিত পন্থায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর অবস্থান ও অবদান মূল্যায়নে এর আংশিক চিত্রই পাওয়া যাবে মাত্র।

এ প্রসঙ্গে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব ড. সালেহ কামিলের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক সংস্থা 'জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংক্স অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস' (CIBAFI)-এর চেয়ারম্যান ড. সালেহ কামিল ২০১২ সালে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক-এর পঁয়ত্রিশতম বার্ষিক সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন :

> *'...বিগত দশকগুলোতে অ্যাকাডেমিক গবেষকগণ ও পেশাদার ইসলামী ব্যাংকারগণ এবং শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী ব্যাংকিং-এর পদ্ধতিগত দিকের ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। সুদমুক্ত লেনদেন ও হালাল পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা সফলতাও এসেছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং এ ব্যবস্থার 'মাকাসিদ' বা উদ্দেশ্যগত দিক তথা বণ্টনমূলক সুবিচার, জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খল-মুক্তির বিষয়টি গবেষক, ব্যাংকার ও শরী'আহ্ ফকিহদের চিন্তায় ও কর্মে সেভাবে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার পায়নি।'*

ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য বা মাকাসিদের আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং গণ-মানুষের ব্যাংকরূপে কাজ করার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নিরিখে সর্বস্তরের ছোট-বড় জমাকারীর অর্থ ব্যাংকিং কাঠামোর আওতায় এনে তা জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে কাজে লাগানো ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয় নীতি। এ কারণে ছোট ছোট জমাকারীদেরকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা ইসলামী ব্যাংকগুলোর দায়িত্ব।

দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটি শুরু থেকে মাত্র ১০০ টাকায় জমার হিসাব খুলছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার অনেক আগে থেকেই ১৯৯৫ সাল হতে ১০ টাকায় কৃষকদের হিসাব খুলছে।

গত শতকের মধ্য ভাগে অর্থনীতিবিদরা উন্নয়ন বলতে 'জাতীয় অর্থনীতির সামর্থ্যকে'ই বিবেচনা করতেন। সমাজের ধনী-গরিবের মাথাপিছু গড় আয়ের ভিত্তিতে উন্নয়নের এই ধারণার পরিবর্তে এখন তারা বলছেন: 'সম্পদ কতটুকু উৎপাদিত হলো সেটা আসল কথা নয়। সেই সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা উন্নয়নের পূর্বশর্ত।'

দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কারণ ব্যাখ্যা করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'সম্পদের সীমাবদ্ধতা নয়; বরং সম্পদের ওপর মানুষের অধিকারহীনতাই দুর্ভিক্ষের কারণ'।

সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ ও সম্পদের সামাজিক বণ্টন ইসলামী অর্থনীতির একটি মূল দর্শন। সে আলোকে বিনিয়োগের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ এবং খাত ও ভৌগোলিক অবস্থানগত বহুমুখীকরণ ইসলামী ব্যাংকের জন্য একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও অপরিহার্য কর্মকৌশল।

ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলো কল্যাণ-অকল্যাণের শর'য়ী নীতি হালাল-হারাম মেনে জনকল্যাণধর্মী কাজে তাদের আহরিত সম্পদ নিয়োজিত করার নৈতিক বাধ্যবাধকতার অধীন। ইসলামী ব্যাংকগুলো আর্থিকভাবে লাভজনক হলেও কোনো অকল্যাণকর খাতে বিনিয়োগ করতে পারে না। রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য হিতকর খাত বা কার্যক্রমে অর্থায়ন করার এই নীতি মানার বাধ্যবাধকতার কারণে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড গত তিন দশকে তামাক খাতে এক টাকাও বিনিয়োগ করেনি।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আর্থিক মূল্যে আকর্ষণীয় ও লাভজনক মনে না হলেও ইসলামী ব্যাংকগুলো এ খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার মোট বিনিয়োগের ৪ শতাংশ ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য তার প্রায় একুশ শতাংশ জনশক্তি নিয়োজিত করেছে। এটি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একটি দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে।

ইসলামী ব্যাংকগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অর্থায়ন করে। অর্থায়ন ছাড়াও যাকাত, ওশর, সাদাকা, কাফ্ফারা ও ওয়াক্ফসহ বিভিন্ন বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক ট্রান্সফার পেমেন্টের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সম্পদ সঞ্চালিত ও প্রবাহিত করে। 'কল্যাণমুখী ব্যাংকিং', 'দরদি সমাজ গঠন', 'উত্তম সেবা' ইত্যাদি স্লোগান বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গির ধারা চিহ্নিত করে।

৫.২ আর্থিক সূচকভিত্তিক অর্জন

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ২৩টি সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের ৮৫৬ টি শাখা, ৮টি প্রচলিত ধারার বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১৯টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও ৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২৫টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো রয়েছে। দেশের মোট ৯০০টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোতে মোট ২৬,৫২৬ জন কর্মী রয়েছেন।

গত পাঁচ বছরে (২০০৯-২০১৩) দেশের ব্যাংকিং খাতে গড় আমানত প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.০৯%। এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.৬৮ ভাগ।

এ সময় বিনিয়োগে দেশের ব্যাংকিং খাতে ১৭.৫৩% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.৬৫%।

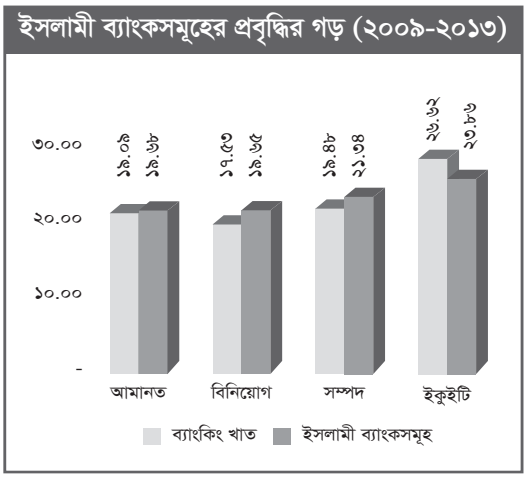

আলোচ্য সময়ে দেশের ব্যাংকিং খাতে মোট সম্পদ বেড়েছে গড়ে ১৯.৪৮% হারে। এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে ২১.৩৪%।

আলোচ্য পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ইকুইটির গড় প্রবৃদ্ধি ২৩.৮৬ ভাগ। এ সময়ে দেশের ব্যাংকিং খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ২৬.৬২ ভাগ। ২০১৩ সালে বেশ ক'টি সরকারি ব্যাংক তাদের মূলধন বাড়িয়েছে। এ কারণে সার্বিকভাবে ব্যাংকিং খাতে ইকুইটির সূচক বেড়েছে।

৫.২.ক আমানত

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট আমানত ছিল ১১৩,৩৬০ কোটি টাকা। এটি দেশের মোট আমানতের ১৮.০০% এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট আমানতের ২৮.৫৪%। সেপ্টেম্বর ১৪-এর হিসাবে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট আমানত ১৩৮,৩৭৩ কোটি টাকা।

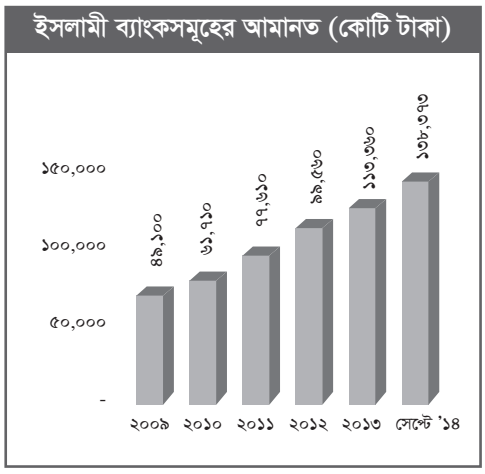

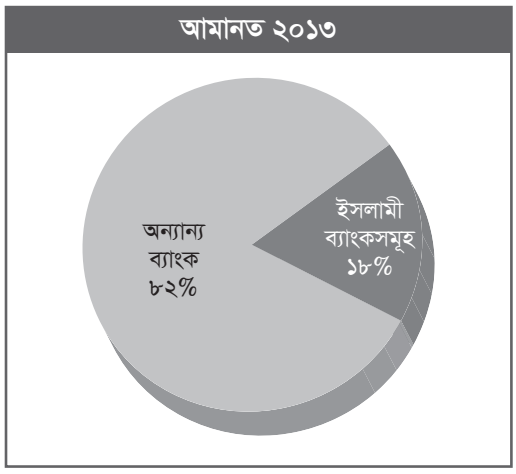

৫.২.খ আমানত হিসাবসংখ্যা

২০১৪ সালের জুনে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট আমানত গ্রাহক ছিল ১ কোটি ২০ লাখ যা দেশের মোট আমানত হিসাবের ১৭.৯২% । এসময় দেশের সব ক'টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট আমানত হিসাব ছিল ২ কোটি ৮৫ লাখ । ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানত হিসাব তার ৪২.১২% ।

৫.২.গ বিনিয়োগ

ডিসেম্বর-২০১৩ অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯৭,৫৩০ কোটি টাকা । এটি দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের ২১% এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের ৩০.০৩% । সেপ্টেম্বর' ২০১৪ হিসাব অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৭,১০১ কোটি টাকা ।

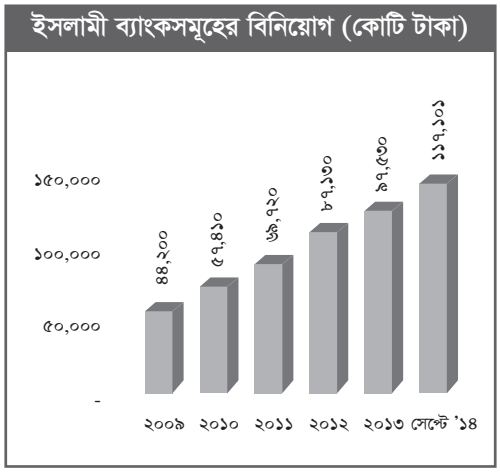

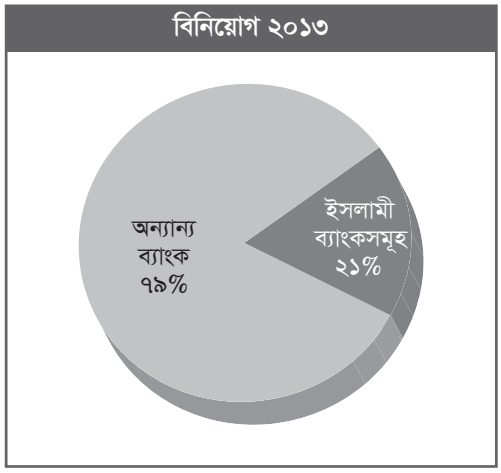

৫.২.ঘ শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ

ডিসেম্বর-২০১৩ সময়ে দেশের ব্যাংকিং খাতে শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ ছিল ৮.৯০% । এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ ছিল ৪.২% ।

একই সময়ে ইকুইটির তুলনায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর শ্রেণীকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৯.৯%, যা দেশের ব্যাংকিং খাতের তুলনায় প্রায় ২০% কম ।

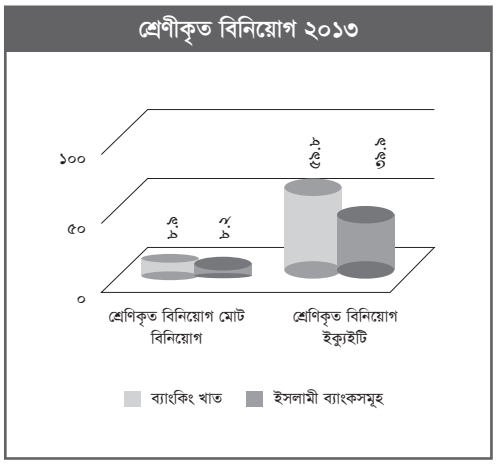

৫.২.ঙ সম্পদ

ডিসেম্বর ২০১৩ সময়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৩৫,৯০০ কোটি টাকা যা দেশের ব্যাংকিং সম্পদের ১৭% এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের ২৭.৪০% । সেপ্টেম্বর' ২০১৪ হিসাব অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদের পরিমাণ ১৫৫,৬৬৬ কোটি টাকা ।

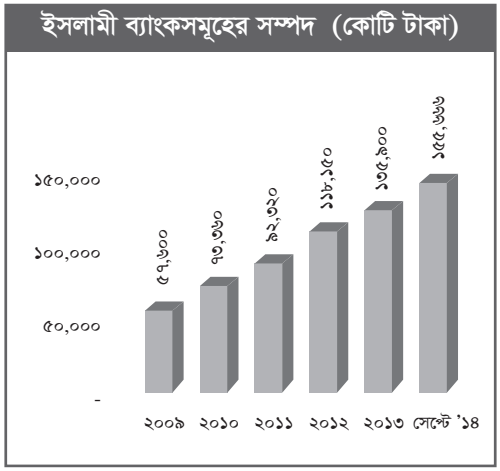

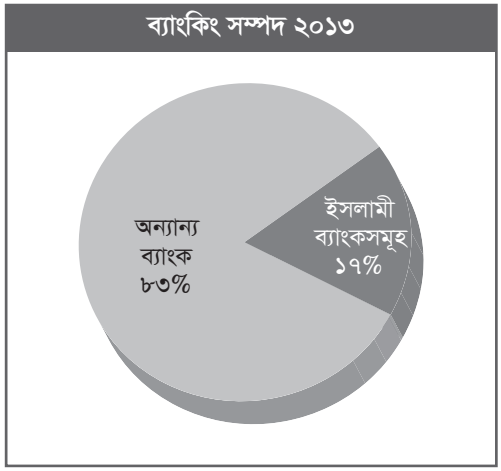

৫.২.চ ইকুইটি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত মূলধন পর্যাপ্ততার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে বিগত বছরগুলোতে মোট ইকুইটিতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বাজার শেয়ার ছিল সন্তোষজনক পর্যায়ে । ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট ইকুইটির পরিমাণ ছিল ১০,২৮০ কোটি টাকা । এটি দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট ইকুইটির ১৫.০০ ভাগ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ইকুইটির ২৩.১৬ ভাগ । সেপ্টেম্বর ১৪ হিসাব অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট ইকুইটি ১০,৬৮২ কোটি টাকা ।

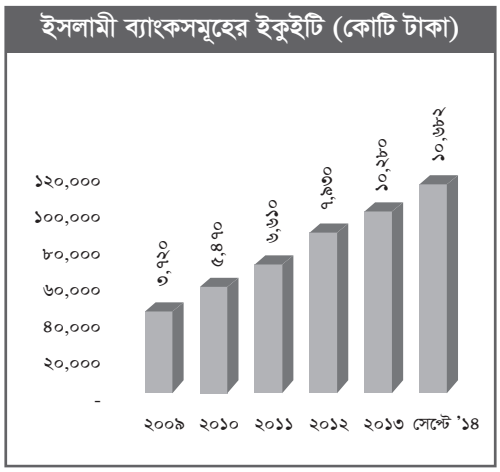

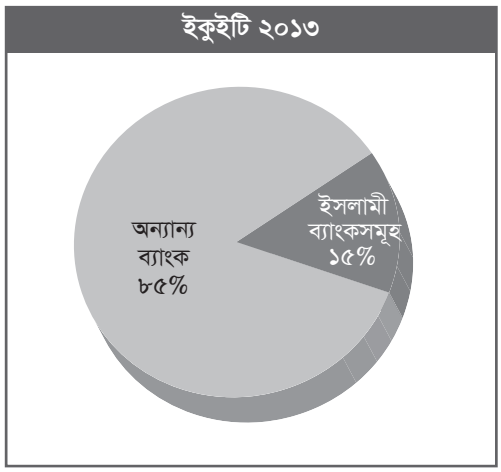

৫.২.ছ বৈদেশিক রেমিট্যান্স

প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক রেমিট্যান্স বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির একটি অন্যতম স্তম্ভ। সহজ উপায়ে দ্রুততার সঙ্গে এই রেমিট্যান্স দেশের উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে ইসলামী ব্যাংকগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ১১৫,৩০৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে মোট ৩১,৭৫৮ কোটি টাকা, যা দেশের মোট রেমিট্যান্সের ২৭.৫%।

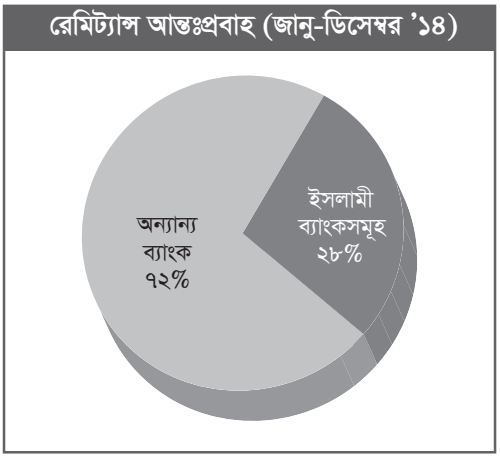

৫.২.জ আমদানি

২০১৪ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে বাংলাদেশে মোট আমদানির পরিমাণ ১৬৭,০১৪ কোটি টাকা। ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে আমদানি হয়েছে ৩৪,৯৫২ কোটি টাকা, যা মোট আমদানির ২১%। সার, তুলা, চাল ও গমসহ বিভিন্ন কাঁচামাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

৫.২.ঝ রপ্তানি

২০১৪ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে দেশের মোট রপ্তানি দাঁড়ায় ১১০,০৯৬ কোটি টাকা। এ সময় ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রপ্তানি হয়েছে ২৬,৭৮৭ কোটি টাকা, যা মোট জাতীয় রপ্তানির ২৪%। তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে ইসলামী ব্যাংকগুলো বরাবরই অগ্রসর ভূমিকা রাখছে।

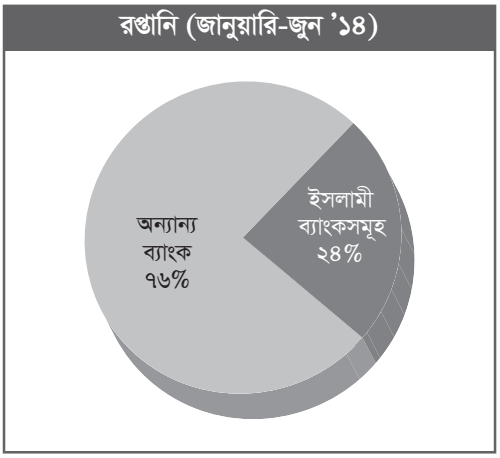

৫.২.ঞ আমানত-বিনিয়োগ অনুপাত

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বেঁধে দেয়া আমানত-বিনিয়োগ অনুপাত ৯০% বিপরীতে জুন'১৪ সময়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানত-বিনিয়োগের অনুপাত ছিল ৮৫.১০% । দেশের ব্যাংকিং খাতে সামগ্রিকভাবে এ অনুপাত ৭২% ।

৫.২.ট মূলধন পর্যাপ্ততা এবং সম্পদ ও ইকুইটির তুলনায় নিট মুনাফার হার

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত শতকরা ১০ ভাগ মূলধন পর্যাপ্ততার (Capital Adequacy Ratio-CAR) বিপরীতে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে দেশের ব্যাংকিং খাতে মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল ১১.৫০% । এ সময় ইসলামী ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল ১২.১৬% ।

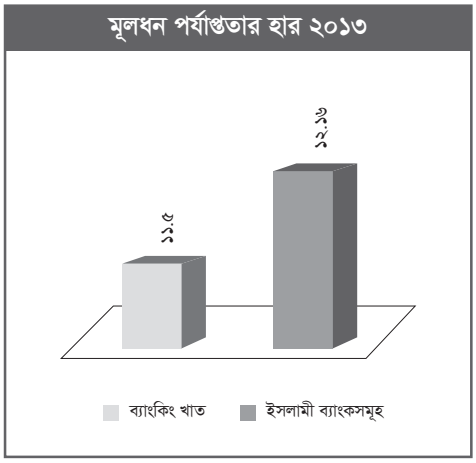

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ২০১২ ও ২০১৩ সালে মোট সম্পদভিত্তিক গড় নিট মুনাফা (Return on Asset-ROA) ছিল ০.৯৮ টাকা । এ সময়ে মোট ইকুইটিভিত্তিক গড় নিট মুনাফার হার (Return on Equity-ROE) ছিল ১৩.০৫ টাকা । এ সময়ে দেশের সার্বিক ব্যাংকিং খাতে এর পরিমাণ ছিল ১৪.১১ টাকা ।

৬. শরী'আহ্ পরিপালন

ব্যাংকিং কার্যক্রম শরী'আহ্-র বিধান মেনে পরিচালনা করার শর্তে ইসলামী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রাপ্ত । এসব ব্যাংকে সে শর্তের মান্যতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নজরদারি করছে । বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য ২০০৯ সালে শরী'আহ্ পরিপালন বিষয়ে একটি নীতি-নির্দেশনা দিয়েছে । ইসলামী ব্যাংকগুলো সে নীতিমালা অনুসরণ করছে ।

এছাড়া শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ব্যাংকে পরিচালনা পর্ষদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বতন্ত্র শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি রয়েছে । বিখ্যাত আলিম, ফিক্হ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও আইনজীবীদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয় । তারা স্বাধীনভাবে তাদের তত্ত্বাবধানমূলক কাজ পরিচালনা করেন । সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর শরী'আহ্ সচিবালয়ের প্রশাসনিক বিষয়াদি ছাড়া সব নীতিগত কার্যক্রম শরী'আহ্ কমিটি তত্ত্বাবধান করেন ।

দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর সকল শরী'আহ্ কমিটির সমন্বয়ে গঠিত 'সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ' (CSBIB) নামক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সময় ব্যাংকগুলোকে শর'য়ী নির্দেশনা দেয়।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন নিশ্চিত করতে নিজস্ব অডিট টিম কাজ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে অফ-সাইট ও অন-সাইট ভিত্তিতে তদারক ও নজরদারি এবং নিরীক্ষা করা হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় একাধিক অডিট ফার্ম প্রতিটি ব্যাংকের কার্যক্রম নিরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদান করে।

এর অতিরিক্ত ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিজস্ব শরী'আহ্ মুরাকিবগণ নিজ নিজ শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির অধীনে ব্যাংকের শরী'আহ্ পরিপালন বিষয়ে নিরীক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি তাদের মুরাকিবদের অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে তাদের প্রত্যয়ন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। ব্যাংকের সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনের পাশাপাশি শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটির প্রত্যয়নপত্র ইসলামী ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান নিরূপণ, পরিচালন ও হিসাবের নীতিমালা ও নিয়মাচার তৈরি করতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গাইডলাইন অনুসরণ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে 'ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড' (IFSB), 'অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউট' (AAOIFI) এবং ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল রেটিং এজেন্সি (IIRA)।

৭. মানবসম্পদ

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে বর্তমানে ছাব্বিশ হাজারেরও বেশি কর্মী রয়েছেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন থেকে তাদের নিয়োগ করা হয়। পেশাগত উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ব্যাংকগুলো তাদের জনশক্তিকে উৎসাহিত করে।

ইতোমধ্যে অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী শরী'আহ্, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে এককভাবে আইবিবিএল-এর ১৪ জন কর্মকর্তা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। দেশের মোট ৩০৬ জন 'সার্টিফাইড ডকুমেন্টারি ক্রেডিট স্পেশালিস্ট' (সিডিসিএস) সনদপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মধ্যে ১৭১ জনই বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে ১৩৬ জন এককভাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ কাজ করছেন।

ইসলামী ব্যাংকের কর্মীগণ 'ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ' (আইবিবি)-এর অধীনে ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষায় নিয়মিত অংশ নেন। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদের জনশক্তিকে নানাভাবে উৎসাহ দেয়।

বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক সাধারণভাবে ব্যাংকিং নীতি-প্রথা অনুশীলনের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সাথে শরী'আহ্ বিষয়েও জনশক্তিকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়। প্রায় সকল ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমি (আইবিটিআরএ) তাদের নিজস্ব জনশক্তির পাশাপাশি অগ্রণী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ফাউন্ডেশন কোর্স ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে। এছাড়াও নাইজেরিয়ার জায়েয ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ও শ্রীলঙ্কার ব্যাংক অব সিলোন-এর উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে আইবিবিএল ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর পেশাগত মানে জনশক্তিকে পারদর্শী করার জন্য ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমি (আইবিটিআরএ) ১৯৯৮ সালে থেকে 'ইসলামী ব্যাংকিং ডিপ্লোমা' (DIB) চালু করেছে। বিভিন্ন ব্যাংকের ৩,৭৩৯ জন কর্মকর্তা এ যাবত ইসলামী ব্যাংকিং ডিপ্লোমা (DIB) প্রথম ভাগ এবং ১,৬৯৬ জন কর্মকর্তা দ্বিতীয় ভাগ সম্পন্ন করেছেন।

৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান

ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের সার্বিক কার্যক্রমে দেশের আর্থিক কর্মকাণ্ডের অগ্রাধিকার খাতকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এভাবে অর্থনীতির গতি দ্রুততর করতে সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। শিল্পায়ন, এসএমই, কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প, পল্লী অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি এবং প্রবাসী গ্রাহকসেবার নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে।

৮.১ শিল্পায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো সার্বিক জনকল্যাণ এবং দেশের অবহেলিত অঞ্চলের উন্নয়নসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়। তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, ইস্পাত, ঔষধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রাসায়নিক ইত্যাদি শিল্পে ইসলামী ব্যাংকগুলো দেশের মোট বিনিয়োগের এক-চতুর্থাংশের বেশি বিনিয়োগ করেছে।

আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পে বিনিয়োগকে ইসলামী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার দেয়। শিল্পায়নে এই ব্যাংকগুলো দেশের মোট বিনিয়োগের ২৩.১১% ধারণ করছে। বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ অবকাঠামো উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

আইবিবিএল তার বিনিয়োগের প্রায় ৪৫% শিল্প খাতে নিয়োজিত করে ব্যাপক শিল্পায়নের পাশাপাশি প্রায় ২৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

৮.২ এসএমই ও কৃষি খাত

ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের বিরাট আকৃতির চেয়েও তাদের বিনিয়োগের প্রকৃতির দিকটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব ব্যাংক সব ধরনের অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগে বেশি অবদান রাখছে। এগুলো তাদের মোট বিনিয়োগের ২৭.৯৬% ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে বিনিয়োগ করেছে।

কৃষি ও পল্লী বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতাভুক্ত খাত ও উপ-খাতগুলোতেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর ভালো অবদান রয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ইসলামী ব্যাংকগুলো শস্য, মৎস্য সম্পদ, প্রাণিসম্পদ, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রায় ১৭শ' কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বিশেষত খাদ্যবীজ সংরক্ষণ, হিমাগার, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, নবায়নযোগ্য শক্তি, হালকা প্রকৌশল শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, পাটজাত ও পাট মিশ্রিত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, চালকল, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি উৎপাদনমুখী শিল্পে ব্যাপকভাবে অর্থায়ন করছে ইসলামী ব্যাংক।

৮.৩ বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংকগুলোর রয়েছে জনকল্যাণমুখী নানা ধরনের বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প। দেশের নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে 'গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প', 'পল্লী গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প', 'গৃহসামগ্রী প্রকল্প', 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প', 'ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিনিয়োগ প্রকল্প' 'ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প' ইত্যাদি। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে এ ব্যাংক প্রকৃত প্রয়োজনভিত্তিক বিনিয়োগ করছে।

৮.৪ দারিদ্র দূরীকরণ ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন

আইবিবিএল গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে ১৯৯৫ সালে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' (আরডিএস) নামে ইসলামী পদ্ধতির মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রকল্পের কাজ শুরু করে। জুন ২০১৪ পর্যন্ত এ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামীণ কৃষি, মাছ চাষ, জীবিকা, যোগাযোগ, আবাসন, বনায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশের প্রায় সতেরো হাজার গ্রামের প্রায় নয় লাখ উপকারভোগী পরিবার এ প্রকল্পের সেবা গ্রহণ করছেন।

মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রমের আওতায় গত দু'দশকে ইসলামী ব্যাংকগুলো ৮,৭৫৬ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। যার বর্তমান স্থিতির পরিমাণ প্রায় ১,৫৪০ কোটি টাকা। জামানতবিহীন, স্বল্পমুনাফা হার এবং সহজ কিস্তিতে পরিশোধের কারণে এ প্রকল্পের আদায় হার ৯৯.৪৭% ।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের (আরডিএস) সদস্যগণ সাপ্তাহিকভিত্তিতে এ পর্যন্ত ৫১২ কোটি টাকা সঞ্চয় গড়ে তুলেছেন। আরডিএস-এর অধীনে কল্যাণ ফান্ড গঠন করে ইসলামী ব্যাংক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কল্যাণ তহবিলের অধীনে এ যাবত লক্ষাধিক উপকারভোগীর কাছে সেবা পৌঁছানো হয়েছে।

বাংলাদেশের ইসলামী পদ্ধতির মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রম আইডিবি, সিগ্যাপ ও ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রশংসা কুড়িয়েছে।

২০১২ সাল থেকে আইবিবিএল শহরের ভাসমান ও হতদরিদ্রদের জন্য 'আরবান পুওর ডেভেলপমেন্ট স্কিম' (ইউপিডিএস) নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ২৬০টি কেন্দ্রে এই প্রকল্পের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এসবের বাইরে কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক এনজিওর সহায়তায় মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রকল্পের জন্য কাজ করছে।

৮.৫ উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন

উদ্যোক্তা উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলো সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী বিভিন্ন খাতকে চিহ্নিত করে শিক্ষিত যুব সমাজকে ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্যোক্তা তৈরি করছে। এ উদ্যোগের ফলে অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সফল শিল্পোদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা উদ্যমী তরুণ ও প্রবাস ফেরত নাগরিকসহ সম্ভাবনাময় জনশক্তিকে ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভালো উদ্যোক্তায় পরিণত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলো কাজ করছে।

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি গ্রাহক থেকে ক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের বহু উদ্যোক্তা এখন দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মূল অর্থনৈতিক ধারা তথা সেবা, শিল্প ও বাণিজ্যে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক এ প্রকল্পের আওতায় নারীদের বিভিন্ন খাতে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেছে।

আইবিবিএল-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের নয় লাখ সদস্য এবং তার ভেতর ছয় লাখ আশি হাজার গ্রাহকের প্রায় ৮০ শতাংশই নারী। তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক উদ্যোক্তা পাঁচ হাজার টাকা বিনিয়োগ দিয়ে শুরু করে বর্তমানে এসএমইর আওতায় নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। নারীর ক্ষমতায়নে এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৮.৬ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ইসলামী ব্যাংকগুলোর অন্তর্নিহিত ধারণা বা মূলশক্তি। ইসলামী ব্যাংকিং নিছক 'সুদযুক্ত' থেকে 'সুদমুক্ত' হবার খণ্ডিত ও সীমিত ধারণা নয়। বরং সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত এবং নানা কারণে যাদের সোজা মাথাগুলো নুয়ে পড়েছে তাদেরকে সোজা ও সটানভাবে দাঁড় করানোর একটি মৌল দর্শনভিত্তিক প্রত্যয় অনুসরণকারী ব্যবস্থা। এ কারণে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বঞ্চিত ও দারিদ্রের ক্ষমতায়ন ইসলামী ব্যাংকিং-এর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৌশল। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন ব্যাংকিং হিসাব চালু করেছে। এর মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে থাকা বিপুল জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং-এর আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে।

গার্মেন্টস শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, কর্মজীবী শিশু ও পথশিশুদের ন্যূনতম প্রাথমিক জমায় হিসাব খোলার মাধ্যমেও ইসলামী ব্যাংকগুলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচিকে বেগবান করছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে। ওয়াক্ফ ও মোহর হিসাবের মতো বিশেষ কল্যাণমুখী হিসাবগুলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তীকরণ এবং ব্যাংকবহির্ভূত হতদরিদ্রদের মাঝে যোগবন্ধন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৯. গ্রিন ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংকিং মূলগতভাবেই সবুজ ব্যাংকিং। বাংলাদেশে ব্যাংকিং-এর সবুজায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। কল্যাণের পতাকাবাহী এই ব্যাংকগুলো তামাক, মাদক, অশ্লীলতা বা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিকর খাতে কোনো বিনিয়োগ করে না। ধূসর কোনো বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। প্রতিটি বিনিয়োগে পরিবেশ সুরক্ষার প্রক্রিয়া অবলম্বন ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য নৈতিক বাধ্যবাধকতা।

গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক জ্বালানী সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সোলার প্যানেল ব্যবহার, অনলাইনভিত্তিক শতভাগ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ নিশ্চিত করেছে।

১০. সামাজিক দায়বদ্ধতা

ইসলামী ব্যাংকিং সমাজে পারস্পরিক দায়বোধ ও দরদি মনোভাব জাগ্রত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি চমৎকার মাধ্যম। সার্বজনীন কল্যাণে নিবেদিত এই ব্যাংকগুলো স্বাভাবিক লেনদেনের বাইরে জনগণের কল্যাণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, শহরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমে অবদান রাখছে।

এছাড়া ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবদানের গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসেবে বিবেচিত হবে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংকগুলো ২০১৩ সালে প্রায় ১১৮ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এ পরিমাণ ব্যাংকিং খাতের মোট সিএসআর ব্যয়ের ২৬%-এর বেশি।

১১. বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং

আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়াং-এর ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ব্যাংকিং কম্পিটেটিভনেস রিপোর্ট ২০১৩-১৪ মতে, বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্পদের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত চার বছরে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্পদের গড় প্রবৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ১৮%। আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্পদের পরিমাণ ছিল ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। গত চার বছরে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো বার্ষিক গড়ে ১৮% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়াং-এর রিপোর্টে বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট গ্রাহকসংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ৩৮ মিলিয়নের বেশি। এ সময়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট গ্রাহকসংখ্যা ছিল প্রায় ১৩ মিলিয়ন। অর্থাৎ, গ্রাহকসংখ্যার দিক দিয়ে সারা দুনিয়ার ইসলামী ব্যাংকিংয়ের এক-চতুর্থাংশ এককভাবে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো ধারণ করছে।

গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির দিক থেকে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান কনসালটেটিভ গ্রুপ টু অ্যাসিস্ট দি পুওর (CGAP)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুবিধাভোগীর সংখ্যার বিচারে বাংলাদেশের আইবিবিএল এককভাবে বিশ্বের ইসলামিক মাইক্রো ফাইনান্স কার্যক্রমের অর্ধেকটা পরিচালনা করছে।

বিশ্ববিখ্যাত 'দি ব্যাংকার' ম্যাগাজিন মূলধন (Tier-I Capital) বিবেচনায় বিশ্বের ১০০০টি ব্যাংকের একটি তালিকা প্রণয়ন করে। ২০১২ সালের র‍্যাংকিং-এ বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাংক হিসেবে আইবিবিএল এতে ১০০০তম স্থান অর্জন করে। ২০১৩ সালে এই ব্যাংকটির অবস্থান ৯৮৪ এবং ২০১৪ সালের র‍্যাংকিং-এ ৯৭০তম স্থানে উন্নীত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং এবং সেইসাথে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম বিশ্বের শীর্ষ ১০০০ ব্যাংকের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

আইডিবির অনুরোধে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নাইজেরিয়ায় 'জায়েজ ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল' প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছে। জায়েজ ব্যাংকের একটি সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমকে প্রথমে ঢাকায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এরপর প্রধান নির্বাহীসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের জন্য আইবিবিএল-এর আট সদস্যের একটি টিম উক্ত ব্যাংককে তিন বছরের চুক্তিতে সরবরাহ করা হয়।

শ্রীলঙ্কা ও উগান্ডার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্যও ইসলামী ব্যাংক ঢাকায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। এ ধরনের কার্যক্রম বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংকে বিশ্ব পরিসরে পরিচিত করার সহায়ক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউট (AAOIFI), ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB), ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি (IICRA), ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফান্ড মার্কেট (IIFM)-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক সংস্থা বা ফোরামের সদস্যপদ গ্রহণ করে এসব সংস্থার সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পেশাগত উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে।

১২. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সম্ভাবনার কিছু নির্দেশক

১২.১ ইসলামী ব্যাংকিং আইন

মালয়েশিয়া ও তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার আগে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাস করা হয়। থাইল্যান্ডে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয় ২০০৩ সালে। আর ২০০২ সালে সেদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাস করা হয়। এভাবে বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা আইনের সমর্থন পেয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টরের এক-পঞ্চমাংশের বেশি এখন ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং বিভিন্ন সূচকে এগিয়ে আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সামর্থ্যও বেড়েছে যথেষ্ট। ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র কর্মধারার উপযোগী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার জন্য স্বতন্ত্র ব্যাংকিং আইনের প্রয়োজন।

২০১১ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম বিষয়ে একটি বৈঠকে এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেন। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাশ হলে এখানে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম আরো সুসংহত হবে।

১২.২ শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্রমবিকাশমান ধারা শক্তিশালী করতে দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদের প্রয়োজন। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং-এ ছাব্বিশ হাজারের বেশি জনশক্তি কাজ করছেন। বাংলাদেশে ব্যাংকিং-এর এক-পঞ্চমাংশ দ্রুত প্রসারমাণ এ ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী ও ব্যাংকিং পদ্ধতি দেশের শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এই উপ-খাতের জন্য জনশক্তি সরবরাহের সুযোগ বাড়ানো দরকার।

ইতোমধ্যে দু-একটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সীমিত পরিসরে কোর্স চালু হয়েছে। এটি প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। এই খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য পর্যায়ে এ বিষয়ে কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১২.৩ উচ্চতর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলো মূলত ফাউন্ডেশন ও ওরিয়েন্টেশনধর্মী কোর্স এবং কিছু ক্ষেত্রে মধ্যমপর্যায়ের প্রশিক্ষণের উপযোগী। দেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। বিশ্বমানের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইন্সটিটিউট বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মালয়েশিয়া ও বাহরাইন গবেষণা ও প্রশিক্ষণে নিজেদের অবস্থান অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছে। সেসব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা তাদের এই অবস্থানে যেতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) ও বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (বিবিটিএ) ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সীমিতপর্যায়ে কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স ও গবেষণা কর্মশালা চালু করেছে। এ ধরনের কার্যক্রম আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য দেশে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হলে দেশের ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের সক্ষমতা এবং সামর্থ্য বাড়বে। আন্তর্জাতিক মানের

সিলেবাস অনুসরণ করে এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি ও স্বতন্ত্র ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা যেতে পারে। এর ফলে এই খাতে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের অভাব পূরণ হবে এবং তা দক্ষ জনশক্তি তৈরির সহায়ক হবে।

১২.৪ গাইডলাইন আধুনিকায়ন

ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আনয়ন ও নীতিমালার সমতা বিধানের জন্য ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে এবং এরপর এক দফা পরিমার্জন করা হয়েছে। এই নীতি নির্দেশনা দেশের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের ব্যাপ্তি, পদ্ধতিগত ভিন্নতা এবং নতুন প্রডাক্ট ও শরী'আহ্ অনুশীলনের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নিয়মিত এই গাইডলাইন উন্নয়ন ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার।

১২.৫ কেন্দ্রীয় শরী'আহ্ বোর্ড

মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য একটি কেন্দ্রীয় শরী'আহ্ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলো পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে অভিন্ন নীতিপদ্ধতি অনুসারে ব্যাংক পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতায় অনুরূপ একটি কেন্দ্রীয় শরী'আহ্ বোর্ড গঠন করা হলে তা অভিন্ন নীতিমালার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় সহায়ক হবে। এর ফলে ইসলামী ব্যাংকিং পরিপালন, নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন এবং এ বিষয়ে গবেষণাকার্যক্রমে যথাযথ সমন্বয় ও নতুন মাত্রা যোগ হবে। এ ব্যাপারে বাইরের দুনিয়ার সাথে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এর যোগাযোগ ও মর্যাদা বাড়বে।

১২.৬ গবেষণা ও উন্নয়ন

ইসলামী ব্যাংকগুলো মানুষের বিভিন্ন চাহিদা সামনে রেখে বৈচিত্র্যময় বহু প্রোডাক্ট চালু করেছে। এ পদ্ধতিতে আরো নিত্যনতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবনের অবারিত সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। 'সুকুক' (ইসলামী বন্ড)-সহ মুদ্রা ও পুঁজিবাজারসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রোডাক্ট উন্নয়নে গবেষণার বিষয়টি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়া ও বাহরাইন একটি ভাল উদাহরণ। বাংলাদেশের উদীয়মান এই নতুন ব্যবস্থার ব্যাংকগুলোর গবেষণা ও উন্নয়নকার্যক্রম জোরদার করা দরকার। ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলো সময়োপযোগী নিত্য নতুন আরও প্রোডাক্ট উদ্ভাবনের পাশাপাশি উন্নততর সেবাদানে অধিকতর সামর্থ্য ও সক্ষমতা লাভ করবে।

১২.৭ অভিন্ন কর্মপদ্ধতি অনুসরণ

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে এ ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে আরো গতিশীল ও বেগবান করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময় দরকার। মালয়েশিয়াভিত্তিক ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB) এবং বাহরাইনভিত্তিক অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউট (AAOIFI) কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন মান অনুসরণ এবং অভিন্ন শরী'আহ্ নীতি ও পদ্ধতি বাস্তবায়নেও এ মতবিনিময় সুফল দেবে। এর ফলে ইসলামী ব্যাংকারদের সামর্থ্য এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও গ্রাহকের আস্থা ও নির্ভরতা বাড়বে।

১২.৮ আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং

বিশ্বের ৬৫টির বেশি দেশে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং চালু আছে। ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মার্কেট শেয়ার সে দেশের মোট ব্যাংকিং সম্পদের ১৮ শতাংশ। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং এ দিক থেকে পিছিয়ে নেই। বরং বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধরন ও প্রকৃতি এবং পরিমাণ ও ব্যাপ্তি মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে ভালো। সে নিরিখে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো বেশি গুরুত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে।

দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর সমিতি 'ইসলামিক ব্যাংক্স কনসালটেটিভ ফোরাম' (IBCF) বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন করেছে। এসব অনুষ্ঠানে আইডিবির প্রেসিডেন্টসহ বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রমকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে তুলে ধরার জন্য এ ধরনের কার্যক্রম আরো বাড়ানো দরকার।

শেষ কথা

একটি টেকসই, যুগোপযোগী ও মানবিক ব্যাংক হিসাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক ভূমিকা মূল্যায়ন করে ২০১৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (আইএফএসবি) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেছেন : *'...With its ethical, inclusivity promoting and stability enhancing attributes, Islamic finance undoubtedly bears promise of playing major beneficial role in our socio-economic development.'*

বস্তুত, ইসলামী ব্যাংকিং একটি সার্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিশ্বের সব মানুষের সামনে উন্নয়নের একটি নতুন মডেল উন্মোচিত করেছে।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতের কিংবদন্তি পুরুষ লুৎফর রহমান সরকারের একটি উক্তি দিয়ে শেষ করছি। তিনি বলতেন, ব্যাংকব্যবস্থা মানবিক করার প্রয়োজনে একবিংশ শতক শেষ হওয়ার আগেই দেশের সার্বিক ব্যাংকিং ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে।

ব্যাংকিংব্যবস্থার মানবিক চেহারা নিশ্চিত করার জন্য আমরাও সে প্রত্যাশা করি।

তথ্যসূত্র

১. চাপড়া, এম. উমর (২০০০), ইসলাম অ্যান্ড ইকনমিক চ্যালেঞ্জ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, যুক্তরাজ্য।

২. সিদ্দিকি, এম. নেজাতুল্লাহ (১৯৮৩), ইস্যুস ইন ইসলামিক ব্যাংকিং, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, যুক্তরাজ্য।

৩. কাহ্ফ, মনজের, (২০০২), স্ট্র্যাটেজিক ট্রেন্ডস ইন দ্য ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স মুভমেন্ট, যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড ফোরাম অন ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং-এর সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ (এপ্রিল ৬-৭, ২০০২)।

৪. নিয়েনহাস, ভলকার (২০১১), ইসলামিক ফাইন্যান্স ইথিকস্ অ্যান্ড শরী'আহ্ ল' ইন দ্য আফটারম্যাথ অব দ্যা ক্রাইসিস: কনসেপ্ট অ্যান্ড প্র্যাকটিস অব শরী'আহ্ কমপ্লায়েন্ট ফাইন্যান্স, ইন: ইথিক্যাল পারসপেকটিভস, ভলিয়ম ১৮, ইস্যু নং ৪।

৫. উলসন, রডনি, ২০১২, লিগ্যাল, রিগুলেটরি অ্যান্ড গভার্ন্যান্স ইস্যু'স ইন ইসলামিক ফাইন্যান্স, ইডেবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস অ্যান্ড কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, নিউ ইয়র্ক।

৬. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল (২০০৭) ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, সেন্ট্রাল শরীয়া'হ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ।

৭. হামিদ, এম.এ. (১৯৯৯), ইসলামী অর্থনীতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনীতি বিভাগ।

৮. ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ব্যাংকিং কম্পিটিটিভ রিপোর্ট ২০১৩-১৪, আরনেস্ট অ্যান্ড ইয়াং।

৯. দ্য ইকোনোমিস্ট (আগস্ট ০৬, ১৯৯৪), সার্ভে অব ইসলাম, যুক্তরাজ্য।

১০. দি ব্যাংকার জুলাই ২০১৪ ইস্যু, টপ ১০০০ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকস র‍্যাংকিং, যুক্তরাজ্য।

১১. ডেভেলপম্যান্ট অব ইসলামিক ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ এপ্রিল-জুন ২০১৪, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১২. কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি (২০১৪-২০১৫) বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৩. বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন।

১৪. ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম, ২০১৩-২০১৪, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

১৫. রিভিউ অব সিএসআর অ্যাকটিভিটিস অব ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর ২০১৩ (জুন ২০১৪), বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৬. ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০১৩, ইস্যু-৪, জুন ২০১৪, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৭. শিডিউল্ড ব্যাংক স্ট্যাটিস্টিকস ডিসেম্বর'১৩ ও মার্চ'১৪, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৮. গ্লোবাল ইসলামিক ফিন্যান্স রিপোর্ট ২০১৩, এডবিজ কনসাল্টিং লিমিটেড, ইউকে।

ইসলামী অর্থায়নের বিশ্বায়ন : কল্পনা না বাস্তব

ফ্রেডারিক ভি পেরি ও শেহেরাজাদে এস. রেহমান

১. সূচনা

ইসলামী অর্থায়ন বা ইসলামী ব্যাংকিং[১] সত্যিকার অর্থেই বিশ্বায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। নতুন এই ব্যবস্থা কি প্রচলিত অর্থায়ন ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হচ্ছে? নাকি এর প্রবক্তারা একটি কল্পকাহিনী ছড়িয়ে আত্মতুষ্টি লাভের চেষ্টায় নিজেরাই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এই নিবন্ধে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উত্থান সম্পর্কিত ইস্যু এবং বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় ইসলামী অর্থায়নের একীভবন ও প্রবৃদ্ধির পথে বাধাসহ ইসলামী অর্থায়নের বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এখানে যে মূল প্রশ্নটি রাখা হয়েছে তা হলো একটি ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী অর্থায়নের বিশ্বায়ন আদৌ সম্ভব কি না এবং যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে কিভাবে?

ইসলামী ব্যাংকিং-এর উত্থান

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উদ্ভব বেশি দিনের নয়। আল-কুরআনে বর্ণিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ধারণার মধ্যে রয়েছে সামাজিক ন্যায়বিচার–যা থেকে ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক পর্যায়ে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিস্তার ঘটে। ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি মালয়েশিয়ায় এবং ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে পাকিস্তানে ক্ষুদ্রাকারে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়। তবে, এগুলো বেশি দিন টেকেনি। এরপর মালয়েশিয়ায় ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের একটি ঐতিহ্যের সূচনা ঘটে।[২] সম্ভবত মালয়েশিয়ায় যাত্রা শুরু করা প্রথম ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল 'মুসলিম পিলগ্রিম সেভিংস কর্পোরেশন।' একজন মুসলমান যেন জীবনে অন্তত একবার মক্কা-মদিনায় গিয়ে হজ সম্পাদন করতে পারেন সে লক্ষ্যে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য ১৯৬৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৩]

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং-এর সূচনা পর্বে এমন আরেকটি প্রতিষ্ঠানের দেখা পাওয়া যায় মিসরে। ১৯৬৩ সালে আহমেদ এল নাজ্জার এ সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা থেকে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তখন ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা তুলে ধরা হয়নি। এটা

ফ্রেডারিক ভি পেরি, ক্লিনিক্যাল প্রফেসর অব বিজনেস ল', ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র।

শেহেরাজাদে এস. রেহমান, প্রফেসর অব ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র।

১ এই নিবন্ধে 'ইসলামী অর্থায়ন' ও 'ইসলামী ব্যাংকিং' পরিভাষা দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেকোনো একটি পরিভাষা দিয়েই পরস্পরকে বুঝাবে।

২ আরিফ, মোহাম্মদ, "ইসলামিক ব্যাংকিং", এশিয়ান-প্যাসিফিক ইকনমিক লিটারেচার, খণ্ড ২, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃ: ৪৬-৬২।

৩ প্রাগুক্ত।

ছিল মিসরের বিরূপ 'সেকুলার সরকারে'র অধীনে একটি সাহসী পদক্ষেপ।[৪] এরপর ১৯৭১ সালে নাসের সোস্যাল ব্যাংক (সুদমুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক) নামে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রকাশ্যে যাত্রা শুরু করে। তখনো মিসর সরকার নাসের সোস্যাল ব্যাংকের সনদে ইসলাম বা শরী'আহ্ আইন প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ করেনি।[৫] ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফিলিপাইন আমানাহ্ ব্যাংক (পিএবি)। তবে এখানেও ব্যাংকের সনদে ইসলামী ব্যবস্থার কোনো উল্লেখ ছিল না।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে একটি আন্তঃসরকার ইসলামী ব্যাংক - ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬] ইসলামী শরী'আহ্ নীতি অনুযায়ী ৫৭টি সদস্যরাষ্ট্র এবং অমুসলিম দেশগুলোর মুসলিম কমিউনিটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি)।[৭] এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো এই ধারণা লুফে নেয় এবং মালয়েশিয়া ১৯৮৩ সালে বেশ বড় আকারে ইসলামী ব্যাংকিং বাজারে প্রবেশ করে। কয়েকটি দেশ পুরোপুরি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু এবং প্রচলিত ধারার আর্থিক ব্যবস্থা থেকে নিজেদেরকে বের করার উদ্যোগ নেয়। ইরান ১৯৮৩ সালের আগস্টে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া শুরু করে। এ জন্য তিন বছরের ক্রান্তিকাল ঠিক করে তারা। ১৯৯৭ সাল থেকে পাকিস্তান ধারাবাহিকভাবে তার ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের দিকে নিয়ে যায়।

১৯৭০-এর দশক জুড়ে বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বলতে গেলে এর সবগুলোই মধ্যপ্রাচ্যে। এগুলোর মধ্যে ছিল দুবাই ইসলামিক ব্যাংক (১৯৭৫), ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান (১৯৭৭), ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব ইজিপ্ট (১৯৭৭), বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক (১৯৯৭), মালয়েশিয়ান মুসলিম পিলগ্রিমস সেভিংস কর্পোরেশন (১৯৮৩)[৮], ইত্যাদি।[৯]

---

৪ প্রাগুক্ত।

৫ প্রাগুক্ত।

৬ ৫৭টি সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) গঠিত। এর সদস্যদেশগুলো তাদের জনগণসহ বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত এবং অগ্রগতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে নিজেদের সম্পদ একত্র করা, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো এবং একই সুরে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাবাতে মুসলিম বিশ্বের নেতাদের প্রথম সম্মেলনে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদস্যরাষ্ট্রগুলো হচ্ছে : আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, বাংলাদেশ, বেনিন, ব্রুনাই, বুর্কিনা-ফাসো, ক্যামেরুন, শাদ, কমোরোস, আইভরি কোস্ট, জিবুতি, মিসর, গ্যাবন, গাম্বিয়া, গিনি, গিনি-বিসাউ, গায়ানা, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, জর্ডান, কাজাখস্তান, কুয়েত, কিরগিজিস্তান, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মালি, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, মোজাম্বিক, নাইজার, নাইজেরিয়া, ওমান, পাকিস্তান, প্যালেস্টাইন, কাতার, সৌদি আরব, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সুদান, সুরিনাম, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, টোগো, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, উগান্ডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান ও ইয়েমেন।

৭ এই ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্যে ইকুইটি ক্যাপিটাল-এ অংশগ্রহণ এবং সদস্যদেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি এগুলোর উৎপাদনশীল প্রকল্প ও উদ্যোগে ঋণ মঞ্জুর। ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্যে আরো রয়েছে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন এবং অমুসলিম দেশগুলোর মুসলিম সম্প্রদায়কে সহায়তার জন্য উদ্দেশ্যভিত্তিক তহবিল গঠন ও পরিচালনা। ব্যাংককে শরী'আহ্সম্মত উপায়ে তহবিল সংগ্রহ এবং আর্থিক সম্পদ সমাবেশের কর্তৃত্ব দেয়া হয়। এছাড়া সদস্যদেশগুলোর মধ্যে বিশেষ করে মূলধনী সম্পদের মতো বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়ন, সদস্যদেশগুলোকে কারিগরি সহায়তা এবং শরী'আহ্ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মুসলিম দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট জনবলের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সূত্র: http://www.isdb.org/.

৮ এটা ছিল মালয়েশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংক।

৯ আরিফ, মোহাম্মদ, "ইসলামিক ব্যাংকিং", এশিয়ান-প্যাসিফিক ইকনোমিক লিটারেচার, খণ্ড ২, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃ: ৪৬-৬২।

পশ্চিমা দেশগুলোতেও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৮ সালে প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে লুক্সেমবার্গে হাজির হয় একটি প্রতিষ্ঠান (পরে এর নতুন নামকরণ করা হয় ইসলামিক ফিন্যান্স হাউজ)।[১০] এর কিছু দিনের মধ্যে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিক ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল। সম্প্রতি বাহরাইনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সিটি ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক।[১১] ২০০৪ সালে ইউরোপে জার্মানির স্যাক্সোনি-আনহল্ট রাজ্য প্রথম শরী'আহ্সম্মত বন্ড ইস্যু করে।[১২] আরবিতে একে বলা হয় সুকুক, যা বর্তমানে ইসলামী দুনিয়ার বাইরেও ইস্যু ও বিক্রি করা হচ্ছে।[১৩] এর স্বীকৃতি হিসেবে গ্লোবাল ফিন্যান্স ম্যাগাজিন চালু করে ওয়ার্ল্ড'স বেস্ট ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স অ্যাওয়ার্ড।[১৪] ইসলামী রিটেইল ব্যাংকগুলো এখন মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কেন্দ্রগুলোতে ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী সম্পদ ব্যবস্থাপকরা বিচরণ করছেন।[১৫] কানেকটিকাট রাজ্যের শরী'আহ্ ক্যাপিটালকে যুক্তরাষ্ট্রের সেরা ইসলামী আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে গ্লোবাল ফিন্যান্স।[১৬]

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে ঘোষিত ইশতেহার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক'। ১৯৭৫ সালের জুলাইয়ে এই ব্যাংকের 'বোর্ড অব গভর্নরস'-এর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যাংকটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে একই সালের ২০ অক্টোবর। এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো একক ও যৌথভাবে শরী'আহ্ তথা ইসলামী বিধান অনুযায়ী সদস্যদেশ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতিসাধনের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো।

১৯৯০-এর দশক নাগাদ ১০টির মতো ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৫ সাল নাগাদ এর সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০টি।[১৭] মালয়েশিয়ায় ইসলামী সিকিউরিটিজের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট প্রাইভেট ডেট সিকিউরিটিজের প্রায় ৪২%-এর মতো এবং মোট বন্ডের প্রায় ২৫%।[১৮] ইসলামী ব্যাংকিংয়ের

---

১০ আরিফ, মোহাম্মদ, "ইসলামিক ব্যাংকিং", এশিয়ান-প্যাসিফিক ইকনোমিক লিটারেচার, খণ্ড ২, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃঃ ৪৬-৬২।

১১ প্রাগুক্ত।

১২ *"Government mulls issuing Islamic bonds"*, রয়টার্স নিউজ, ইউকে, ২৩ এপ্রিল, ২০০৭।

১৩ নাইট, ম্যালকোলাম ডি. *"The Growing Importance of Islamic Finance in the Global Financial System"*, ৬ ডিসেম্বর ২০০৭, ফ্রাঙ্কফুর্টে ২য় ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড ফোরামে দেয়া বক্তৃতা, পৃঃ ২, দেখুনঃ *www.bis.org/speeches/sp071210.htm*

১৪ প্রাগুক্ত।

১৫ প্রাগুক্ত।

১৬ *"Islamic Financial Institutions Awards 2008"*, অ্যানুয়াল সার্ভেঃ ইসলামিক ফিন্যান্স, গ্লোবাল ফিন্যান্স, জুন ২০০৮, পৃঃ ৩৮।

১৭ এল-ফাকহানি, সাইদ ও এম. কবির হাসান, *"Performance of Islamic Mutual Funds"*, ইকনমিক রিসার্চ ফোরাম, ১২তম বার্ষিক সম্মেলন, কায়রো, মিসর, ডিসেম্বর ২০০৫।

১৮ এল কুরশি, মোহাম্মেদ, *"Islamic Finance Gears Up"*, ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, খণ্ড ৪২, সংখ্যা ৪, আইএমএফ, ডিসেম্বর, ২০০৫।

দ্রুত প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। ১৯৮৫ সালে যে বাজার ছিল মাত্র ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের, ১৯৯৪ সালে তা দাঁড়ায় ৬০ বিলিয়ন ডলারে। ২০০৫ সালের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় সম্পদের পরিমাণ ৫০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়।[১৯] এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৫%। 'স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুরস'-এর মতে বিগত ১০ বছর ধরে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রবৃদ্ধি ছিল প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে অনেক বেশি।[২০] মোদি ইনভেস্টর সার্ভিসেস-এর মতে ইসলামী অর্থায়ন বাজারের সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল প্রোডাক্ট হলো সুকুক যা প্রতি বছর ৩৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০১০ সালের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ বিলিয়ন ডলারে উত্থিত হয়। বর্তমানে ইসলামী অর্থায়নের বিশ্ববাজার ১.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২১] আসল কথা হলো ইসলামী ব্যাংকিং বাজারের সত্যিকার আওতা কেউ জানে না। এ ব্যাপারে উপাত্ত সংরক্ষণের দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে।[২২] ২০০৬ সালে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স সেন্টার-এর খালিদ ইউসুফ জানান, তখন পর্যন্ত এই শিল্পের আকার ৩০০ বিলিয়ন ডলার এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৮২টির মতো, যার বেশিরভাগ আকারে ক্ষুদ্র।[২৩] ২০০৬ সাল পর্যন্ত কেবল দুই বৃহৎ ইসলামী ব্যাংক - দুবাই ইসলামিক ব্যাংক ও সৌদি আরবের আল-রাজি ব্যাংক-এর প্রত্যেকটির পুঁজির পরিমাণ ছিল ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি।[২৪] তবে সব মিলিয়ে অনেকে মনে করেন ইসলামী অর্থায়ন শেষ পর্যন্ত বৈশ্বিক রূপ নিচ্ছে এবং একান্তভাবে আঞ্চলিক পরিসরে ঘুরপাক খাওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যাবে এ দাবি সম্ভবত পুরোপুরি সত্য নয়।

১০টি বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের সম্মিলিত জিডিপি ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার[২৫] যা বিশ্ব জিডিপির ২.৭%।[২৬] তাই এসব দেশে ইসলামী ব্যাংকিং বেশ জনপ্রিয় হলেও বিশ্ব অর্থনীতিতে এর প্রভাব নগণ্য। ফলে এই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হতে হলে তাকে এসব দেশের বাইরের জনগণের কাছেও আকর্ষণীয় হতে হবে। একে অমুসলিম দেশগুলোতেও ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত হতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি বৈশ্বিক শক্তি হওয়ার মতো বাস্তব প্রমাণেরও অভাব রয়েছে। কোনো একটি বৃহৎ বেসরকারি ব্যাংকের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মোট সম্পদ (২০০৮ সালে ৭০০ বিলিয়ন ডলার ধরে নিলে) তুলনা করলেই এটা বোঝা যাবে। ২০০৮ সালে ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ড

---

১৯ *"Islamic Finance Market Turns to Securitization",* ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল ল' রিভিউ, লন্ডন, জুলাই ২০০৫, পৃঃ ১।

২০ ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল আউটলুক ২০০৬ : ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস রেটিংস, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃঃ ৮।

২১ *http://www.nbr.org/research/activity.aspx?id=370; "Islamic Financial Institutions Awards 2008",* অ্যানুয়াল সার্ভে: ইসলামিক ফিন্যান্স, গ্লোবাল ফিন্যান্স, জুন ২০০৮, পৃঃ ২৮।

২২ অনিতা হাওসের, *"Profits With Principles",* গ্লোবাল ফিন্যান্স, জুলাই/আগস্ট, ২০০৬, পৃঃ ২৩।

২৩ প্রাগুক্ত।

২৪ প্রাগুক্ত।

২৫ বিশ্বব্যাংকের উপাত্ত, (বিশ্ব উন্নয়ন সূচক), ওয়াশিংটন ডিসি, ২০০৬।

২৬ প্রাগুক্ত।

(ইবিএস)-এর মোট সম্পদ ছিল ২,১৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২৭] এমনকি ইসলামী অর্থায়নের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ হলেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানত প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ১৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আমানতের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র বলা চলে। তাছাড়া প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকগুলো সু-মূলধনী (well capitalized) নয়। এগুলোর ৮০ শতাংশ-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নিচে।[২৮] আরব উপসাগরীয় দেশগুলো আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং ক্রমেই আরো বড় হলেও জিসিসির ঋণ বাজারের একটি বড় অংশ দখল করে আছে প্রচলিত অর্থায়ন।[২৯] তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক-পশ্চিমা ধাঁচের আর্থিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কি না তা নিয়েও সংশয় রয়ে গেছে। ইসলামী ব্যাংকিং একটি প্রমিত মানে উন্নীত হওয়ার পথে বড় বাধা অভিন্ন ইসলামিক ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুসরণ না করা।[৩০] অধিকন্তু, অনেকে মনে করেন ইসলামী ব্যাংকিং-এর বর্তমান প্রবৃদ্ধি পুরোপুরি ইসলামী নীতি মেনে হয়নি। এর বড় অংশ এসেছে এমনসব আর্থিক সেবা ও পণ্য থেকে, যেগুলো এমনভাবে তৈরি যে বিশেষ গ্রাহকশ্রেণী এগুলোকে ইসলামী মনে করে আকৃষ্ট হন।[৩১]

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়ার হাসান জুবাইর[৩২] মনে করেন প্রচলিত ব্যাংকিং-এর তুলনায় এই শিল্পের বিকাশ দ্রুত হয়েছে।[৩৩]

২. ইসলামী আইনশাস্ত্র ও অর্থব্যবস্থা

ইসলামী আইন এক অর্থে মানবিক আইনের ঐতিহ্যগুলোর একটি মিশ্রপদ্ধতি। এর ভিত্তি হলো ঐশী বিধান তথা আল-কুরআন এবং সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি। রাষ্ট্র কর্তৃক তৈরি আইন (সিভিল ল') বা প্রচলিত রীতিনীতি (কমন ল') সমাজের উভয় ধরনের আইনই মানুষের সৃষ্ট। মানুষ এগুলো পরিবর্তনও করে নিজের প্রয়োজনে। তাই সমাজ, অর্থনীতি বা সময় বদলে গেলে এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে আইনও বদল হয়, উদ্ভব হতে পারে নতুন আইনের। যেমন ই-কমার্স ও ইন্টারনেটের আগমনের ফলে একটি নতুন ও অভিন্ন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। স্থানীয়, জাতীয় এবং বৈশ্বিক

---

২৭ ফার্স্ট কোয়ার্টার ২০০৮ রিপোর্ট, ৬ মে ২০০৮, ইউএসবি ফিন্যান্সিয়াল হাইলাইটস।

২৮ অনিতা হাওসের, *"Profits With Principles"*, গ্লোবাল ফিন্যান্স, জুলাই/আগস্ট, ২০০৬, পৃঃ ২৩।

২৯ প্রাগুক্ত।

৩০ লুকা এরিকো ও মিত্র ফারাবখশ, *"Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision"*, আইএমএফ ওয়ার্কিং পেপার, ১৯৯৮, ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ), মার্চ ১৯৯৮ পৃঃ ৩।

৩১ দেখুন : শেহেরাজাদে রেহমান, *"Globalization of Islamic Finance Law"*, উইসকনসিন ইন্টারন্যাশনাল ল' জার্নাল, স্প্রিং ২০০৮। উক্ত নিবন্ধের কিছু অংশ এই নিবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩২ হাসান জুবায়ের, *"Islamic Finance Education at Graduate Level: Current Positions and Challenges"*, মিউনিখ পার্সোনাল *RePEc* আর্কাইভ, পেপার নং ৮৭১২, মে ২০০৮। *http//mpra.ub.uni-muenchen.de/8712/*

৩৩ প্রাগুক্ত।

পর্যায়ে ধীরে ধীরে এসব আইন প্রণীত হচ্ছে। কিন্তু, ঐশী বিধান শরী'আহ্ তেমনটি নয়। এই আইনের নীতিমালা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু মূল বিধান অপরিবর্তনীয়।[৩৪] বর্তমান যুগের আধুনিক আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করতে শত শত বছর ধরে আইনশাস্ত্রের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে যে সিভিল ও কমন ল'-এর উদ্ভব ঘটেছে তার সঙ্গে ইসলামী আইনের মধ্যে ফারাক দূর করতে গিয়েই মূলত সমস্যা দেখা দেয়। ১০০০ সালের দিকে মুসলিম ফকিহগণ ঘোষণা করলেন যে শরী'আহ্ বিধানের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে গেছে। এরপর সমাজে আমূল পরিবর্তন ঘটলেও বেশিরভাগ মাজহাবের চিন্তাবিদরা বিভিন্ন বিষয়ে বিধিবিধান তৈরিতে আর তেমন মনোনিবেশ করেননি।[৩৫]

ইসলামে আইনের উৎসও ধর্ম। তাই একটিকে বুঝতে হলে আমাদেরকে অন্যটিও বুঝতে হবে। "মুসলমানদের জন্য কুরআন হলো সৃষ্টিকর্তার বাণী, যা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে রাসুল মোহাম্মদ (স.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে। মোহাম্মদ (স.)-কে কুরআনের আয়াতগুলো পাঠ করতে বলা হয়। এই আয়াতগুলোর সঙ্কলনই কুরআন।"[৩৬] ইসলামী আইন বা শরী'আহ্-র প্রাথমিক উৎস দুটি হলো-কুরআন ও সুন্নাহ তথা নবী মোহাম্মদ (স.)-র প্রদর্শিত জীবনধারা ও তাঁর বাণী। এ ছাড়াও তিনটি মাধ্যমিক উৎস রয়েছে। এগুলো হলো মুসলিম চিন্তাবিদদের কোনো বিষয়ে ঐক্যমত্য বা কিয়াস, বিভিন্ন উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ওইসব চিন্তাবিদ বা পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা ও গবেষণার ফসল।[৩৭] মুসলিম চিন্তাবিদ বা আলেমগণ উদ্ভূত পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে আল-কুরআন ও সুন্নাহ-র ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে শরী'আহ্-র মাধ্যমিক উৎস হিসেবে কাজ করেন।[৩৮] আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট ও সেবা উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় একজন মুসলমানকে তার জন্য কোনটি নিষিদ্ধ বা কোনটি নিষিদ্ধ কাজ নয় এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করা হয়নি – এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।[৩৯] যদিও একটি চিন্তাধারার অনুসারীরা দাবি করেন, কুরআনে 'সুদ' নিষিদ্ধ করা হয়নি[৪০] কিন্তু, এটি

---

৩৪ ফ্রেডারিক ভি. পেরি, *"Shari'ah, Islamic Law and Arab Business Ethics"*, দ্যা কানেকটিকাট জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ল', খণ্ড ২২, সংখ্যা ১, স্প্রিং ২০০৭।

৩৫ জোসেফ স্কচ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৮২, চ্যাপ্টার ১০।

৩৬ কারেন আর্মস্ট্রং, *A History of God,* ব্যালান্টাইন বুকস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৩, পৃঃ ১৩৯-১৪০। আরো দেখুন, সাইয়েদ হুসাইন নাসের, *Ideals and Realities of Islam,* এবিসি ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ, ইনক, শিকাগো, ২০০০, অধ্যায় ২। ফ্রেডারিক ভি পেরি তার *"Shari'ah, Islamic Law and Arab Business Ethics"*, দ্য কানেকটিকাট জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ল', খণ্ড ২২, সংখ্যা ১, স্প্রিং ২০০৭-এ যেমনটা উল্লেখ করেছেন।

৩৭ প্রাগুক্ত, অধ্যায় ৪। আরো দেখুন, সাচিকো মুরাতা এবং উইলিয়াম সি. চিত্তিক, *The Vision of Islam,* প্যারাগন হাউজ, সেন্ট পল, মিনেসোটা, ১৯৯৪, সূচনা।

৩৮ পেরি, প্রাগুক্ত।

৩৯ এটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণে, আল-কুরআনে কিছু বিষয়ে শুধু সাধারণভাবে বলা হয়েছে, এটা কারো করা 'উচিত নয়'; এভাবে বলা হয়নি যে, এটা 'অবশ্যই' কেউ করবে না। ইসলামী আইনের কিছু চিন্তাধারায় প্রথমোক্তটি গ্রহণ করে সেগুলোকে নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মেকনেস-এ পেরি-র সঙ্গে ইব্রাহিম জিনিবারের আলোচনা, মরক্কো, ডিসেম্বর ২৫, ২০০৮ থেকে নেয়া হয়েছে।

৪০ দেখুন, বারবারা এল. শেনিয়াউস্কি, *Riba Today: Social Equity, the Economy, and Doing Business Under Islamic Law,* কলম্বিয়া জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ল', খণ্ড ৩৯, ২০০১, পাওয়া যাবেঃ *lexis-nexis.com.novacat.nova.edu/universe/document?_m=16f08905210418.*

নিতান্তই অতি ক্ষুদ্র একটি পক্ষের অভিমত ।[৪১] আবার এমনও আছেন যারা মনে করেন মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুদ আরোপ করা কেবল অনুমোদিতই নয়, আল-কুরআনে অতিরিক্ত প্রাচুর্য লাভের বিরুদ্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে তা প্রতিপালনের জন্য একটি আবশ্যিক শর্ত ।[৪২] কারণ, ঋণদাতা যদি কেবল আসল ফেরত পায় তাহলে ঋণগ্রহীতা যত বিলম্বে পরিশোধ করবে মুদ্রাস্ফীতির কারণে ঋণদাতা তত লোকসানে পড়বে । ইসলামের ন্যায্যতা এই লোকসানে বাধা দেয়ার কথা ।

মুদ্রা আবিষ্কারের পর, যখন ব্যাপকভাবে তামার মুদ্রার প্রচলন শুরু হলো তখন সুন্নি মতাদর্শের ৪টি ধারাই[৪৩] সুদের ওপর নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশনা দেয় । তখন কেবল ওইসব বস্তুর ওপর সুদ আরোপ নিষিদ্ধ ছিল যেগুলো প্রথম থেকেই নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিল যথা : পণ্যদ্রব্য, সোনা ও রুপা । তাই প্রথম দিকে তামা বা অন্যান্য ধরনের মুদ্রার ওপর সুদ আরোপের ফতোয়া প্রয়োগ করা হয়নি ।[৪৪] তবে বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত কুরআনের ওই নির্দেশনাকে অনুসরণ করে যেখানে বলা হয়েছেঃ "যারা উসারি (usury) গলাধঃকরণ করে তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে . . .কিন্তু আল্লাহ. . . উসারি নিষিদ্ধ করেছেন । আল্লাহ তায়ালা উসারি নিশ্চিহ্ন করেন ।"[৪৫] সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হচ্ছে, ইসলামী বিধান মোতাবেক সুদ বা 'রিবা' পুরোপুরি নিষিদ্ধ ।[৪৬]

ইসলামী আইনে আর্থিক বা আর্থিক উপাদান লেনদেনের ওপর আরোপ করা হয় এমন আরো কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । এর একটি হলো অনিশ্চয়তা (আরবিতে ঘারার) । এতে বলা হচ্ছে, এমন কিছু বিক্রি করা যাবে না যার বৈশিষ্ট্য বা অস্তিত্ব নিশ্চিত নয় বা এমন কোনো চুক্তি করা যাবে না যার শর্তগুলো অস্পষ্ট । এর আওতায় কোনো বীমা চুক্তি বা ক্রয়-বিকল্প চুক্তি অনুমোদনকে অবৈধ করা হয়েছে । ইসলাম জুয়া (আরবিতে মাইসির) নিষিদ্ধ করেছে । তাই ভবিষ্যতের ওপর ভিত্তি করে কোনো লেনদেন এবং কোনোরকম ফটকাবাজিও অবৈধ । সুনির্দিষ্টভাবে কিছু দ্রব্য নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে শূকরের মাংস, অ্যালকোহল এবং কতিপয় অবৈধ কর্মকাণ্ড । তাই, ইসলামী আইনের আওতায় হোটেল ও বিমানের মতো ক্ষেত্রে অর্থায়ন করা যাবে কি না তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে । কারণ এসব জায়গায় অ্যালকোহলের মতো ইসলামে নিষিদ্ধ বস্তু সরবরাহ করা হয় ।[৪৭]

---

৪১ জোসেফ শস, *An Introduction to Islamic Law,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৮২, পৃঃ ১৪৫ ।

৪২ শেনিয়াউস্কি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮ ।

৪৩ ধারাগুলো হলো হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী । শিয়া মতাদর্শে ইসলামী আইনশাস্ত্রের জাফরী মাজহাব অনুসরণ করা হয় ।

৪৪ শেনিয়াউস্কি, প্রাগুক্ত ।

৪৫ আল-কুরআনের আয়াত ২:২৭৫-২৭৯ । যদিও "উসারি" শব্দটির সঠিক অনুবাদ 'রিবা' নয়; "উসারি"-র সঠিক অনুবাদ হলো সুদের একটি অন্যায্য পরিমাণ, সাধারণ সুদ নয় । আরবি ভাষায় কখনো কখনো একে "বৃদ্ধি" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে । এসব বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ মুসলমান সুদ আরোপ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একমত ।

৪৬ আব্দুর রহমান আই. দোই, *Shari'ah: The Islamic Law,* তাহা পাবলিশার্স লিঃ, লন্ডন, ১৯৮৪, পৃঃ ২৭৫-২৭৮ ।

৪৭ *"Islamic Finance Market Turns to Securitization",* ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল ল' রিভিউ, লন্ডন, জুলাই ২০০৫, পৃঃ ২ ।

যদিও বেশিরভাগ মানুষ ইসলামে সুদ আরোপ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি অবগত কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং আরো ৪টি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। মূলত ইসলামী ব্যাংকিং-এর ৫টি মৌলিক নীতিমালা রয়েছে:

১. অর্থের মূল পরিমাণের ওপর যেকোনো ধরনের পূর্বনির্ধারিত পরিশোধ নিষিদ্ধ; এর মানে হলো: সুদ থাকবে না।

২. অর্থ ধার দেয়ার বিনিময়ে কোনো উদ্যোগ থেকে উদ্ভূত লাভ বা ক্ষতির অংশীদার হতে হবে ঋণদাতাকে, যেন অর্থায়নকারীর ক্ষতি করে ঋণগ্রহীতা অন্যায্যভাবে ধনী হতে না পারে।

৩. অর্থ থেকে অর্থ বানানো গ্রহণযোগ্য নয় (এটা ঋণকে শেয়ারে পরিণত করা বা বান্ডলিং অব সিকিউরিটিজ নিষিদ্ধ করে)।

৪. ঘারার (অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি বা ফটকাবাজি) নিষিদ্ধ।

৫. কেবল সেসব ক্ষেত্র বা উৎপাদনে বিনিয়োগ হিসেবে ঋণ দেয়া যাবে যেগুলো নিষিদ্ধ নয় (অ্যালকোহল, শুকরের মাংসজাত কোনো পণ্যের উৎপাদন, ক্যাসিনো ইত্যাদি নিষিদ্ধ)।

ইসলামে সুদ নিষিদ্ধের মৌলিক কারণ হচ্ছে, অন্যদের কঠোর পরিশ্রম ও ঝুঁকির বিনিময়ে আমানতকারী যেন অন্যায়ভাবে মুনাফা করতে না পারেন। প্রচলিত পশ্চিমা অর্থনৈতিক ধারণায়, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত সুদের হার বাজার অর্থনীতির একটি অত্যাবশ্যকীয় চালিকাশক্তি। সুদের হার সঞ্চয়কে প্রভাবিত করে। এর মানে হলো, সুদ যত বেশি হবে তত বেশি সঞ্চয় ও বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা যাবে। এই কর্মকৌশল দক্ষতার সঙ্গে সম্পদকে প্রাচুর্যের জায়গা থেকে দুষ্প্রাপ্যের জায়গায় নিয়ে যায়। প্রচলিত ব্যাংকিং ও অর্থায়নব্যবস্থায় মনে করা হয় যে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে নৈপুণ্যের সঙ্গে পুঁজি বণ্টন ও আকৃষ্ট করা যায়।

ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করলেও মুনাফা এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। এখানে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি নিতে হয়। তাই ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগকারীদের (আমানতকারী) তাদের বিনিয়োগের আনুপাতিক হারে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক লাভ (বা ক্ষতি)-এর একটি অংশ প্রদানের প্রস্তাব করে। বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে, তারা বিনিয়োগ বা আমানতের ওপর যে মুনাফা লাভ করে তা থেকে সুদের দুটি বড় পার্থক্য রয়েছে : কতটা মুনাফা পাওয়া যাবে তা অনিশ্চিত। এর মানে হলো বিনিয়োগকারীদের কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই এবং বিনিয়োগকারীকে (পশ্চিমা ধারণায় আমানতকারী) অধিকতর ঝুঁকি নিতে হবে। অন্য দিকে, পশ্চিমা ব্যবস্থায় আমানতকারীর ঝুঁকি কম। কারণ তার মুনাফা নির্ধারিত এবং আমানতকারীদের পুঁজির সামনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টেকহোল্ডারদের পুঁজি সবার আগে ঝুঁকির মুখে থাকে।

এখানে তরলীকরণ বা আর্থিক সঙ্কটকালে ব্যাংক স্টেকহোল্ডারদের পাওনার আগে আমানতকারীদের মূল অঙ্ক ও এর ওপর নিশ্চিত মুনাফা বা সুদ পরিশোধ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকের ওই

অনুশীলন থেকে ইসলামী ব্যাংকিং অনুশীলনে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। আবার কখনো কখনো এ দু'য়ের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্যও রয়েছে। দুই অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্যের ধরনটিও দেশভেদে বিভিন্ন।[৪৮] তাই এটা স্পষ্ট যে কেউ ইসলামী আর্থিক আইনশাস্ত্র অনুসরণ বা অনুসরণের চেষ্টা করতে চাইলে তাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে। কারণ ইতিহাসের এক কঠিন সময়ে একটি পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটছে। সাধারণভাগে গ্রহণযোগ্য মত হলো, ইসলামী ব্যাংককে শরী'আহ্সম্মত হতে হবে এবং তাই এর একটি শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড থাকবে (যার উপদেষ্টাগণ হবেন যোগ্য ইসলামী আইনবিদ)। কোনো আর্থিক পণ্য এবং সেবা শরী'আহ্সম্মত আর কোনটি নয়, সেই সিদ্ধান্ত (নির্দেশনা বা ফতোয়ার আকারে) দেবে এই বোর্ড।[৪৯] কিন্তু বিভিন্ন দেশে একেকটি ব্যাংক নিজস্ব পছন্দে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড গঠন করার ফলে সমস্যা দেখা দেয়। আবার বড় ব্যাংকগুলোর পক্ষে তাদের শরী'আহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড-এ বেশি অর্থ ব্যয়ে সুবিজ্ঞ ও সুপরিচিত মুসলিম আইনজ্ঞদের নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়। এতে বড় ব্যাংকগুলোর আর্থিক পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে তাদের দেয়া ফতোয়া অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে।[৫০]

৩. ইসলামী আর্থিক সেবা শিল্প

ইসলামী অর্থায়ন শিল্প বৃহত্তর বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার অংশ হলেও এটি শরী'আহ্ আইন ও বিধিমালার ভিত্তিতে তৈরি উপাদান, অবকাঠামো, ইন্সটিটিউশন ও বাজার নিয়ে কাজ করে। ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থা প্রচলিত আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত সব ধরনের কার্যক্রম চালাতে যথেষ্ট সক্ষম এবং এর অনেক উপখাত রয়েছে যেগুলো প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার অনুরূপ। এসব উপখাতের মধ্যে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্প, ইসলামী অর্থবাজার, ইসলামী পুঁজিবাজার (ইকুইটি ও বন্ড মার্কেট), তাকাফুল (ইসলামী বীমা) এবং ইসলামী সম্পত্তি/সম্পদ ব্যবস্থাপনা শিল্প।

ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (জিসিসি) অঞ্চল, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। এসব দেশে ইসলামী ব্যাংকিং যে ধরনের ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থা অনুসরণ করে তার মধ্যে রয়েছেঃ ক. দ্বৈত ব্যবস্থা (মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া); খ. প্রচলিত এবং ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন টানা দ্বৈত ব্যবস্থা এবং ইসলামী ব্যবস্থা (বাহরাইন ও জর্ডান)। যেসব দেশে দ্বৈতব্যবস্থা রয়েছে সেখানে এইচএসবিসি, সিটিব্যাংক, এনএ, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড, ডয়েশ ব্যাংক, বিএনপি পারিবাস বা এবিএন আমরো-র মতো বিশালায়তন গ্লোবাল ব্যাংকগুলোকে ইসলামী উইনডো বা আলাদা ইসলামী ব্যাংকিং সাবসিডিয়ারি খুলে ব্যাংকিং ব্যবসা করতে দেখা যায়।

---

৪৮ লুকা এরিকো ও মিত্র ফারাবখশ, *"Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision"*, আইএমএফ ওয়ার্কিং পেপার, ১৯৯৮, ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ), মার্চ ১৯৯৮, পৃঃ ৩।

৪৯ *"Anything But Conventional?"* [ইসলামিক ব্যাংকিং], ব্যাংকার মিডলইস্ট (সিপিআই ফিন্যান্সিয়াল), ইস্যু-৪৩, জানুয়ারি ২০০৪।

৫০ ম্যাক শেলি, উইল অ্যান্ড শান্তি নাম্বিয়ার, ব্লুমবার্গ নিউজ আর্টিকেল, *"Islamic Bond Fatwas Surge on Million-Dollar Scholars"*, ব্লুমবার্গ নিউজ, ১ মে, ২০০৭। *http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid=a.DsH16oTM6U&refer=home.*

গ. আর্থিক ব্যবস্থার পুরোপুরি ইসলামীকরণ : প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যত অনুপস্থিত। কেবল পুরোপুরি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয় (ইরান, পাকিস্তান এবং সুদান)।

ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার সাম্প্রতিক উন্নয়ন এই শিল্পের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ, শিল্পটি দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত বৃহত্তর আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে বৃহত্তর একীভবনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী শরী'আহ্সম্মত আর্থিক সেবার যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা তৈরি হয়েছে তা মেটাতে বহু দেশ তাদের আর্থিক কেন্দ্রগুলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে না হলেও অন্তত ইসলামী অর্থায়নের আঞ্চলিক হাব-এ উন্নীত করার নীতি বাস্তবায়ন করছে। বিশ্ব জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মুসলমান হলেও এখন পর্যন্ত ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা বৈশ্বিক ব্যাংকিং সম্পদের মাত্র ১ শতাংশ ধারণ করছে। তাই ইসলামী অর্থায়ন প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল।

৪. বিশ্বমানের ইসলামী অর্থায়ন আইন

যেসব দেশে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে সাধারণভাবে দেখা যায় সেখানকার ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকের মতো একই আইনের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই আইনকে সাধারণভাবে 'ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন'-এর নীতিমালা অনুসরণ করতে দেখা যায়। কিন্তু এই মান সাধারণভাবে ইসলামী আর্থিক লেনদেনের জন্য পুরোপুরি প্রয়োগ করা যায় না।[৫১] যুক্তরাজ্যের ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস অথরিটি বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছে এভাবে, কোনো ইসলামী ব্যাংক লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করলে, তার কিছু আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে আলাদা হলেও তাকে কোনো পক্ষপাতমূলক সুবিধা দেয়া হবে না। ব্রিটিশরা সবসময় সুস্থির ব্যবস্থাপনা ও সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি চায়।[৫২] ব্রিটিশ রেগুলেটরি অথরিটির কর্মকর্তারা মনে করেন, আমানতকারীদের তহবিল সবসময় ঝুঁকির মধ্যে থাকে। তাদের কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, ইসলামী ব্যাংকগুলো যেসব সেবার প্রস্তাব করছে সেগুলো আসলেই কি ব্যাংকিং সেবা, নাকি তারা তহবিল ব্যবস্থাপক।।[৫৩]

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ব্যাংকগুলো সাধারণত ব্যাসেল কমিটির বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে 'গ্রুপ অব টেন কান্ট্রিজ'[৫৪]-এর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নররা 'ব্যাসেল কমিটি

---

৫১ লুকা এরিকো ও মিত্র ফারাবখশ, *"Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision"*, আইএমএফ ওয়ার্কিং পেপার, ১৯৯৮, ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ), মার্চ ১৯৯৮, পৃ:৩।

৫২ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০২, লেইচেস্টারের হিল্টন হোটেলে 'ইসলামী অর্থায়ন' বিষয়ে আয়োজিত সেমিনারে ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস অথরিটির চেয়ারম্যান হাওয়ার্ড ডেভিস-এর দেয়া বক্তব্য, দেখুন: *www.fsa.gov.uk.*

৫৩ প্রাগুক্ত।

৫৪ বর্তমানে এই কমিটির সদস্য দেশগুলো হচ্ছে বেলজিয়াম, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। কমিটিতে দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে তাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা আনুষ্ঠানিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান সংস্থা। দেখুন: *http://www.bis.org/bcbs/history.htm*

অন ব্যাংকিং সুপারভিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। তারা প্রতিবছর চারবার নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হন। এর চারটি কার্য-কমিটি রয়েছে, তারাও নিয়মিত বৈঠকে বসেন।[৫৫]

ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন-এর ব্যাংকিং আইন ও বিধিমালা সংক্রান্ত সুপারিশগুলোই আসলে দ্বিতীয় ব্যাসেল চুক্তি, যা ব্যাসেল-২ নামে পরিচিত। ২০০৪ সালের জুনে প্রথম প্রকাশিত ব্যাসেল-২ এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রকদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মান সৃষ্টি যা অনুসরণ করে সম্ভাব্য আর্থিক ও পরিচালনাগত ঝুঁকি সামাল দিতে ব্যাংকের পুঁজির কতটুক অংশ রিজার্ভ হিসেবে আলাদা করে রাখতে হবে সে বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন। ব্যাসেল-২ এর প্রবক্তারা মনে করেন যে এই আন্তর্জাতিক মান আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় এক বা একাধিক ব্যাংকের পতন মোকাবেলায় 'সুরক্ষা' হিসেবে কাজ করবে। এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য ব্যাসেল-২ কঠোর ঝুঁকি ও পুঁজি ব্যবস্থাপনার কথা বলে। ঋণদান ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যাংক যে সহজাত ঝুঁকির মুখোমুখি হয় তা মোকাবেলায় ব্যাংক যেন পুঁজির একটি অংশ রিজার্ভ হিসেবে সংরক্ষণ করতে পারে সে দিকে লক্ষ রেখে এ বিধি প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী ব্যাংকের ঝুঁকি যত বড় হবে তাকে তত বড় অঙ্কের অর্থ রিজার্ভ রাখতে হবে।[৫৬]

অনেকটা আইএফএসবি (নিচে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে)-র মতো ব্যাসেল-২ দেখভাল করার জন্য কোনো অতিরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নেই। এমনকি এর কোনো ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতাও নেই। ব্যাসেল-২ কেবল বিস্তৃত পরিসরে তত্ত্বাবধান মান ও দিকনির্দেশনা তৈরি এবং সুপারিশ ঘোষণা করে। এর লক্ষ্য হলো বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষ আলাদাভাবে তাদের নিজস্ব জাতীয় ব্যবস্থার উপযোগী করে ব্যাসেল-২ এর নিয়মগুলো বাস্তবায়ন করবে। ব্যাসেল-২ একটি অভিন্ন মানের দিকে অগ্রসর হতে উৎসাহ জোগায়। কিন্তু সদস্যদেশগুলোর নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের ওপর কোনো প্রমিত বা সমরূপ বিধি চাপিয়ে দেয় না।[৫৭]

এভাবে ব্যাসেল-২ বৈশ্বিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থবাজারকে সুচারুভাবে চলতে সাহায্য করে। তাই একে বলা হয় "আর্থিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড"।[৫৮] আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা দক্ষতার সঙ্গে এবং নিরাপদে পরিচালনার জন্য ব্যাসেল-২ এর রয়েছে তিনটি স্তম্ভ : ন্যূনতম পুঁজি, তত্ত্বাবধায়কদের পর্যালোচনা এবং বাজারের শৃঙ্খলা। ন্যূনতম পুঁজির মানে হলো ব্যাংকগুলোকে ঝুঁকি মূল্যায়ন করে

---

৫৫ ১৯৬৫ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ৮টি ব্যাংক ব্যর্থ (দেউলিয়া) হয়। মূলত ১৯৮০-এর দশকে এসে একের পর এক ব্যাংক ব্যর্থ হতে থাকে, যাকে বলা হয় "সঞ্চয় ও ঋণসঙ্কট"। বিশ্বব্যাপী ব্যাংকগুলো ব্যাপকভাবে ধার দিতে শুরু করে। অন্য দিকে, দেশের বাহ্যিক ঋণগ্রস্ততা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলছিল। ফলে নিম্নমানের নিরাপত্তার কারণে বৃহৎ আন্তর্জাতিক ব্যাংগুলোর দেউলিয়া হয়ে পড়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। এই ঝুঁকি প্রতিরোধের জন্য ১০টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ব্যাসেল কমিটি ১৯৮৭ সালে বাসেল-এ বৈঠকে মিলিত হয়। দেখুন: *http://www.investopedia.com/articles/07/BaselCapitalAccord.asp*

৫৬ দেখুন: *http://www.bis.org*

৫৭ প্রাগুক্ত।

৫৮ ডেভিড হার্পার, *"Basel II Accord to Guard Against Financial Shocks"*, ইনভেস্টোপেডিয়া, *http://www.investopedia.com/articles/07/basel2.asp*

তাদের সম্পদের একটি অংশ পুঁজি হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। তত্ত্বাবধায়কদের পর্যালোচনার মানে হলো ব্যাংকগুলো যেন আইন মেনে চলে তা নিশ্চিত করবে সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ। আর বাজার শৃঙ্খলার মানে হলো ব্যাংককে তার ঝুঁকি প্রকাশ করতে হবে। অন্য কথায়, সেগুলোর কর্মকাণ্ডে অবশ্যই স্বচ্ছতা থাকতে হবে।

বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কট শুরু হওয়ার পর ব্যাসেল-৩ ব্যাংকের পুঁজির পর্যাপ্ততা ও তারল্যের ব্যাপারে একটি নতুন বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণ মান প্রকাশ করে।[৫৯] ব্যাসেল চুক্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং বা অর্থায়নকে যেমন আলাদা করা হয়নি তেমনি এ বিষয়ে কিছু উল্লেখও করেনি। তবে, যুক্তরাজ্যের ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটির সাবেক প্রধান রবার্ট ডেভিস জর্ডানের রাজধানী আম্মানে দেয়া এক বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বর্তমান বিশ্বে ইসলামী অর্থায়ন খাতের আকার ও আয়তনের কারণে ব্যাসেল কমিটিকে এই খাত বিবেচনায় নিতে হবে এবং এর সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।[৬০] কেউ কেউ মনে করেন ব্যাসল-২ এ যে কোলেটারালাইজড ডেট-এর কথা বলা হয়েছে তা ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য শাস্তিস্বরূপ। পশ্চিমা ধারণায় ঋণখেলাপি ঝুঁকি সামাল দিতে যে ধরনের মর্টগেজ এর কথা বলা হয় তা ইসলামী ব্যাংকিং-এর একই ধরনের লেনদেনে অনুসরণ করা হয় না। ইসলামী ব্যাংকের ওপর সে ধরনের কোনো ঝুঁকি থাকে না এবং পরিশোধের ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নেয়া হয়।[৬১]

কতিপয় ইসলামী ব্যাংক ও কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। আবার অন্যরা বলছেন যে ব্যাসেল-৩ হলো ব্যাংকিং সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো ওই সঙ্কটে আক্রান্ত হয়নি। তাই এটি ইসলামী ব্যাংকগুলোর ওপর প্রযোজ্য হবে না।[৬২]

হতে পারে, কিন্তু এরপরও ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রমিতকরণ এখনো সুদূরপ্রসারী বিষয়।

প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মতো বিচক্ষণতার সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধানও জরুরি। কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি সামাল দিতে হবে এবং স্বচ্ছতা থাকতে হবে।[৬৩] অন্যকথায়, জনগণ, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের দৃঢ় আস্থা থাকতে হবে এই ব্যবস্থার ওপর। শরী'আহ্সম্মত অর্থায়নের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের প্রতিফলন ঘটবে এমন একটি আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান মান এবং অনুশীলন উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামী অর্থায়ন শিল্প। এটা ইসলামী অর্থায়নের মানকে বিশ্বব্যাপী বৈধতা দানের জন্য কেবল নিয়ন্ত্রক দৃষ্টিকোণ থেকেই ফলপ্রসূ করবে না, এর ফলে ব্যাংকিং সম্প্রদায় সত্যিকারভাবে একটি গ্লোবাল প্রডাক্ট লাইন সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। 'ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউ ইয়র্ক'-এর ব্যাংক সুপারভিশন গ্রুপের

---

৫৯ ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট-এর ওয়েবসাইট: *bis.org/bcbs/basel3.htm*

৬০ অনিতা হাওসের, *"The Relevance of Basel III to Islamic Banks"*,
পাওয়া যাবে: *http://zulkiflihasan.wordpress.com/2011/02/16/the-relevance-of-basel-iii-to-islamic-banks/*

৬১ প্রাগুক্ত।

৬২ প্রাগুক্ত।

৬৩ লুকা এরিকো, ও মিত্র ফারাবখশ, *"Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision"*, আইএমএফ ওয়ার্কিং পেপার, ১৯৯৮, ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ), মার্চ ১৯৯৮, পৃ: ৩।

এক্সিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উইলিয়াম রুটলেজ[৬৪] ২০০৫ সালে তার এবিএএনএ বক্তৃতায় বলেন:

> এ ক্ষেত্রে, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন্স ফর ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স (AAOFI) এবং ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (আইএফএসবি)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। . . . আইএফএসবি সম্প্রতি ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পুঁজির পর্যাপ্ততা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মান সম্পর্কিত একটি নির্দেশনা প্রকাশ করে। এই মান মুসলিম ও পশ্চিমা দেশগুলোর নিয়ন্ত্রকদের ইসলামী অর্থায়ন অনুধাবন ও তত্ত্বাবধানে সহায়তা করবে। আইএফএসবি ইসলামী আর্থিক সেবা শিল্পের কর্পোরেট গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে। . . . (বিগত কয়েক বছর ধরে ফেডারেল রিজার্ভ-এর কাছে) অবশ্যই কর্পোরেট গভর্নেন্স ইস্যুগুলো ও কমপ্লায়েন্স বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থায় খুবই সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য ফেড ইতোমধ্যে কিছু অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করেছ।[৬৫]

ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট-এর জেনারেল ম্যানেজার ম্যালকম নাইট-এর মতে, যেকোনো ব্যাংক বা আর্থিক ব্যবস্থার জন্য কিছু আবশ্যকীয় "মৌলিক নীতি" রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে "শক্তিশালী কর্পোরেট শাসন, কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু ক্যাপিটাল এডিকোয়েসি রিকোয়ারমেন্ট"।[৬৬] ইসলামী আর্থিক সেবা শিল্পের স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও অনন্য সেবা বজায় রেখেই একে বৈশ্বিক আর্থিক বাজারে পুরোপুরি একীভূত করে নেয়া খুবই জরুরি।

এই শিল্পের সুপারভাইজরি কন্ট্রোল-এর মাত্রা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমপর্যায়ে হতে হবে। ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক মান, অনুশীলন বা প্রয়োগবিধি লঙ্ঘিত হলে তা কেবল এগুলোর সেবা ও পণ্যের ক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে তাদের সেবা ও পণ্যের গ্রহণযোগ্যতার পথে বাধাও সৃষ্টি করবে। এ লক্ষ্যে বেশ প্রচেষ্টা চলছে এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ব্যক্তি কাজ করে যাচ্ছেন।[৬৭]

---

৬৪ রুটলেজ, উইলিয়াম এল, ২০০৫ সালের ১৯ এপ্রিল নিউ ইয়র্কে আরব ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা (এবিএএনএ) আয়োজিত *Islamic Finance: Players, Products & Innovation* শীর্ষক সম্মেলনে দেয়া *"Regulation and Supervision of Islamic banking in the United States"*, শীর্ষক বক্তৃতা।

৬৫ রুটলেজ, উইলিয়াম এল, ২০০৫ সালের ১৯ এপ্রিল নিউ ইয়র্কে আরব ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা (এবিএএনএ) আয়োজিত *Islamic Finance: Players, Products & Innovation* শীর্ষক সম্মেলনে দেয়া *"Regulation and Supervision of Islamic banking in the United States"*, শীর্ষক বক্তৃতা। রুটলেজ ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন-এর সদস্য ছিলেন। দেখুন: *http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/orgchart/rutledge.html.*

৬৬ ম্যালকম ডি. নাইট, *"The Growing Importance of Islamic Finance in the Global Financial System"*, ৬ ডিসেম্বর ২০০৭, ফ্রাঙ্কফুর্টে ২য় ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড ফোরামে দেয়া বক্তৃতা, পৃ: ৩। দেখুন: *www.bis.org/speeches/sp071210.htm*

৬৭ সাধারণভাবে দেখুন, ম্যালকোলাম ডি. নাইট, *"The Growing Importance of Islamic Finance in the Global Financial System"*, ৬ ডিসেম্বর ২০০৭, ফ্রাঙ্কফুর্টে ২য় ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড ফোরামে দেয়া বক্তৃতা, পৃ: ৩। দেখুন: *www.bis.org/speeches/sp071210.htm*

উইলিয়াম রুটলেজ বক্তৃতায় ইসলামিক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ডের (আইএফএসবি) নাম উল্লেখ করেছিলেন। এখন তা প্রধান আন্তর্জাতিক মান-নির্ধারণী সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এটি ইসলামী সেবা শিল্পের উন্নয়ন এবং সক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা জোরদারের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এর সদর দফতর কুয়ালালামপুরে।[৬৮] এটি ব্যাংকিং, পুঁজিবাজার ও বীমাসহ ইসলামী আর্থিক সেবা শিল্পের জন্য মান নির্ধারণ করে দেয়।[৬৯] এ ক্ষেত্রে আইএফএসবি'র কার্যক্রম ব্যাসেল কমিটি,[৭০] ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ সিকিউরিটিজ কমিশন্স[৭১] এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্সুরেন্স সুপারভাইজরস[৭২]-এর সম্পূরক হতে পারে। ইসলামী আর্থিক সেবা শিল্পের জন্য ২০১০ সাল পর্যন্ত আইএফএসবি ৭টি মান, কতিপয় দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা ও কারিগরি নোট প্রকাশ করে। এগুলো ছিল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পুঁজি পর্যাপ্ততা, কর্পোরেট গভর্নেন্স, সুপারভাইজরি রিভিউ প্রসেস, স্বচ্ছতা ও বাজার শৃঙ্খলা, শরী'আহ্সম্মত আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টগুলোর রেটিং-এর স্বীকৃতি এবং সেই সাথে ইসলামী অর্থবাজার উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। আইএফএসবি আরো ৫টি নতুন মান ও দিকনির্দেশনার ওপর কাজ করছিল। এগুলো ছিল ১. পুঁজিপর্যাপ্ততা সম্পর্কিত বিশেষ ইস্যু; ২. বিনিয়োগ তহবিল পরিচালনা; ৩. তাকাফুল (বীমা) কার্যক্রমের কর্পোরেট গভর্নেন্স; ৪. শরী'আহ্ গভর্নেন্স এবং ৫. ব্যবসায়িক আচরণ।[৭৩] যদিও এটি কোনো নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ নয় এবং কোনো ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এর মান অনুসরণ না করলে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতাও এর নেই। ২০১০ সালের ডিসেম্বরে এটি পণ্য মুরাবাহা (প্রচলিত বন্ধকী ব্যবস্থার মতো) লেনদেনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পুঁজি পর্যাপ্ততা সম্পর্কিত একটি দিকনির্দেশনামূলক নোট প্রকাশ করে এবং শিগগিরই এ রকম আরো নোট প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা করে।[৭৪]

---

৬৮ কুয়ালামপুরে অবস্থিত দি ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড ২০০২ সালের ৩ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা এবং ২০০৩ সালের ১০ মার্চ কার্যক্রম শুরু করে। এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে : "দি ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (আইএফএসবি) হলো একটি আন্তর্জাতিক মান-নির্ধারণী সংস্থা। এটি ইসলামী সেবা শিল্পের উন্নয়ন এবং সক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা জোরদারের জন্য কাজ করে। এই শিল্পের জন্য সংস্থাটি ব্যাংকিং, পুঁজিবাজার ও বীমা খাতসহ বিস্তৃত পরিসরে ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার জন্য বিশ্বব্যাপী দূরদর্শী মান ও দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রণয়ন করে। আইএফএসবি এই শিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে গবেষণা ও সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাশাপাশি, নিয়ন্ত্রক ও এই শিল্পের স্টেকহোল্ডারদের জন্য গোলটেবিল, সেমিনার ও কনফারেন্সের আয়োজন করে।" দেখুন: *www.ifsb.org*

৬৯ প্রাগুক্ত।

৭০ ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন হলো ব্যাংকিং খাতের তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়মিত পর্যালোচনার জন্য একটি ফোরাম। এর লক্ষ্য হলো তত্ত্বাবধান সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে সমঝোতা জোরদার এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং খাতের তত্ত্বাবধানের মানোন্নয়ন। দেখুন: *http://www.bis.org/bcbs/index.htm*

৭১ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিকিউরিটি মার্কেটগুলোর নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগুলোকে নিয়ে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক সংস্থা - ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ সিকিউরিটিজ কমিশন্স (আইওএসসিও)। এর সঙ্গে ব্যাসেল কমিটি ও ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্স্যুরেন্স সুপারভাইজরস মিলে গঠিত হয় জয়েন্ট ফোরাম অব ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রেগুলেটরস। বর্তমানে আইওএসসিও সদস্যরা বিশ্ব শেয়ারবাজারের ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। দেখুন: *www.iosco.org*

৭২ ১৯০টির মতো বীমা নিয়ন্ত্রক ও সুপারভাইজর কর্তৃপক্ষকে নিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্স্যুরেন্স সুপারভাইজরস (আইএআইএস)। আর্থিক স্থিতিশীলতা জোরদারের জন্য আইএআইএস আর্থিক খাতের অন্যান্য মান নির্ধারক কর্তৃপক্ষ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। দেখুন: *http://www.iaisweb.org/index.cfm?pageID=28.*

৭৩ *http://www.ifsb.org/index.php?ch=2&pg=1&ac=1*

৭৪ অনিতা হাওসের, *"The Relevance of Basel III to Islamic Banks"*, পাওয়া যাবে: *zulkiflihasan.wordpress.com/2011/02/16/the-relevance-of-basel-iii-to-islamic-banks/*

আইএফএসবি বিশ্বব্যাপী ইসলামী আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এর সুপারিশ অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করে এবং ওইসব প্রতিষ্ঠানের নাম এক্সটার্নাল রেটিংস এজেন্সিগুলোর কাছে সরবরাহ করে, যাতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত হওয়া যায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থা জোরদার হয়।[৭৫] ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল রেটিং এজেন্সি হলো এই খাত সংশ্লিষ্ট রেটিং এজেন্সি।[৭৬] ২০০৫ সালে আইএফএসবি পুঁজি পর্যাপ্ততা মান (ক্যাপিট্যাল অ্যাডিকোয়েসি স্ট্যান্ডার্ড-সিএএস) প্রকাশ করে। এটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শরী'আহ্সম্মত পণ্য ও সেবার কাঠামো ও বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করে। ব্যাসেল কমিটির "ইন্টারন্যাশনাল কনভারজেন্স অব ক্যাপিট্যাল মেজারমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপিট্যাল স্ট্যান্ডার্ড" দলিলে সুনির্দিষ্টভাবে এসবের উল্লেখ নেই।[৭৭] শরী'আহ্সম্মত পণ্য ও সেবাগুলোর ঝুঁকি পরিমাপের একটি মান নির্ধারণের জন্য আইএফএসবি ওই দলিল প্রকাশ করে।

ব্যাসেল-২ বা ব্যাসেল কমিটির আওতাভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজিকাঠামো এবং সম্পদ ভিন্নতর হওয়ায় সেগুলোর 'রিস্ক ওয়েটেড ক্যাপিট্যাল রেশিও' হিসাব করার জন্য একটি অভিন্ন ভিত্তি প্রদান করে সিএএস। প্রতিষ্ঠানটি জানায় এক্সটার্নাল ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো তাদেরকে রেটিং-এর যে দায়িত্ব দেয় তার মাধ্যমে ওইসব প্রতিষ্ঠানের অবস্থা পরিমাপ করা হয়। এর মানে হলো, জাতীয় কর্তৃপক্ষগুলোকে ওইসব এক্সটার্নাল এজেন্সির ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। ব্যাসেল-২ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর জন্যও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।[৭৮]

ব্যাংকের সব সাবসিডিয়ারি ও শাখার সঙ্গে এর আর্থিক উপাত্ত সুসমন্বয় করা হলো আরেকটি নীতি, যা সব ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে হবে এবং সুসমন্বয় নিশ্চিতকরণ ও ব্যাংকের নিজ দেশের কর্তৃপক্ষের ব্যাপকভিত্তিক তত্ত্বাবধানের জন্য এই অনুশীলন অবশ্য পালনীয়। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্যদেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নররা তিন দশক আগেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তখন এ লক্ষ্যে একটি কারিগরি কমিটিও গঠন করা হয়। শরী'আহ্সম্মত ব্যাংকিং সেবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনার জন্য তখন বেশ কয়েকজন গভর্নর ও বিশেষজ্ঞকে এই কমিটির সদস্য করা হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল, ইসলামী ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু সুপারভাইজরি 'রুলস্ অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্টস'-এর মধ্যে থাকতে হবে। তবে, এতে প্রয়োজনীয় নমনীয়তা থাকবে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিশেষ কর্মপদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিতে হবে। এতে এসব ব্যাংক

---

৭৫ দেখুন: *"Guidance Note in connection with the Capital Adequacy Standard: Recognition of Ratings by External Credit Assessment Institutions (ECAIs) on Thari'ah-Compliant Instruments"*, ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড, মার্চ ২০০৮।

৭৬ ইসলামিক রেটিং এজেন্সিগুলোর লক্ষ্য হলো ইসলামী আর্থিক সেবা শিল্পকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভে সহায়তা করা, যেন এগুলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের ডিসক্লোজার ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে চলা অত্যন্ত শক্তিশালী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের দেখাতে পারে। এটি বিনিয়োগকারী ও অন্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে রেটিং-এর ব্যাপারে নিজস্ব মতামত পাঠিয়ে থাকে। *www.iirating.com*

৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ: ১।

৭৮ প্রাগুক্ত।

বৈশ্বিক আর্থিক বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বৈশ্বিক বাজারে অন্তর্ভুক্ত হতে উৎসাহিত করা গেলে তা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাবে। এতে তারা করপোরেট ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক গ্রাহকের প্রয়োজন পূরণের জন্য উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত হবে। ফলে তাদের কাজের ক্ষেত্র ও ভিত্তি সম্প্রসারিত হবে। তখন এগুলোকে সুনির্দিষ্ট ধরনের গ্রাহক বা সুনির্দিষ্ট বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে না। এটা ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার প্রয়োজন পূরণের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ, তাদের কাঠামো উন্নয়ন ও জোরদার এবং সেগুলো ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে বিশ্বায়ন ইসলামী অর্থায়ন বিধির প্রভাব ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ, অর্থায়ন ও ব্যবসার অন্যান্য দিক ক্রমেই অধিক হারে বৈশ্বিক ভিত্তিতে আন্তঃসংযুক্ত হয়ে উঠছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক-এর ম্যালকম নাইট মনে করেন, আইএফএসবি-কে ব্যাসেল-২ এর গ্লোবাল ব্যাংকিং স্ট্যান্ডার্ড বিবেচনায় নিতে হবে।[৭৯] শুধু ইসলামী আর্থিক শিল্প প্রমিতকরণের জন্যই নয় একে বিশ্বমানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্যও ইসলামী মান নির্ধারকরা এ উদ্যোগ নেবেন।

এটা সহজ কাজ নয়। একটি মূল ধারার অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ইসলামী পদ্ধতি প্রমিতকরণ ও বৈশ্বিক স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তত তিনটি গুরুতর বাধা রয়েছে: (১) "ইসলামী অর্থায়ন" বলতে কী বুঝায় সে ব্যাপারে মুসলিম ও ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি; (২) ইসলামী অর্থায়ন শিল্পের জন্য কোনটি শরী'আহ্সম্মত আর কোনটি শরী'আহ্সম্মত নয় তা প্রমিতকরণ; এবং (৩) সার্বিকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের গ্রহণযোগ্যতা এবং আলাদা আলাদাভাবে ব্যাসেল-২ চুক্তির অনুবর্তী হওয়া। এগুলো বেশ কঠিন এজেন্ডা।

৫. বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে যত চ্যালেঞ্জ

দুর্বলতর তারল্য এবং দুর্বল হিসাব ও ডিসক্লোজার কাঠামো নিয়েই ইসলামী ব্যাংকগুলো চলতে চায়।[৮০] এ অবস্থায় প্রমিতকরণ করতে গিয়ে মুসলিম অর্থায়নকারীরা ক্রমাগতভাবে গতানুগতিক পশ্চিমা পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি শরী'আহ্য় নিষিদ্ধ প্রচলিত ধারার উপজাতগুলোও তারা অনুসরণ করেন।[৮১] কিন্তু প্রচলিত এবং একেবারে সাধারণ অর্থায়ন মডেল নিয়েও প্রচুর বিতর্ক রয়েছে।[৮২] তাই কেউ কেউ মনে করেন অনেক ইসলামী ব্যাংক 'শরী'আহ্সম্মত' অর্থায়ন মডেলের নামে যা দিচ্ছে তা প্রতারণামূলক। কারণ, এগুলোর সঙ্গে সুদভিত্তিক আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টগুলোর নামে ছাড়া তেমন কোনো

---

৭৯ ম্যালকোলাম ডি. নাইট, *"The Growing Importance of Islamic Finance in the Global Financial System"*, ৬ ডিসেম্বর ২০০৭, ফ্রাঙ্কফুর্টে ২য় ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড ফোরামে দেয়া বক্তৃতা, পৃ: ৩। দেখুন: *www.bis.org/speeches/sp071210.htm.*

৮০ ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল আউটলুক ২০০৬: ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস রেটিংস, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ: ৮।

৮১ *"International Finance Markets Turn to Securitization,"* ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল রিভিউ, জুলাই ২০০৫, পৃ:৫।

৮২ দেখুন, মাহমুদ এ. এল-গামাল, *"Interest and the Paradox of Contemporary Islamic Law and Finance"*, ফোর্ডহ্যাম ইন্টারন্যাশনাল ল' জার্নাল, খণ্ড ২৭, ১০৮, ডিসেম্বর ২০০৩।

পার্থক্য নেই ।[৮৩] তাই আইএফএসবি, এমনকি ব্যাসেল-২ এর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের উন্নয়নের পথে বড় বাধাটি হচ্ছে একটি ব্যাপকভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য মান ।

মালয়েশিয়ার শরী'আহ্ বোর্ড অব ব্যাংকিং ইন্সটিটিউশন একটি আর্থিক পণ্যকে শরী'আহ্সম্মত হিসেবে অনুমোদন দিলেও পণ্যটি উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে ।[৮৪] মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সুদান ও ইরান ব্যাংকিং মান অনুমোদন দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকপর্যায়ে শরী'আহ্ বোর্ড গঠন করেছে । এর বাইরে বেশিরভাগ দেশে অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ শরী'আহ্ বোর্ড গঠন করে ।[৮৫] আগেই বলা হয়েছে সুন্নি ধারায় ইসলামী আইন ব্যাখ্যার জন্য চারটি মাযহাব রয়েছে ।[৮৬] দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স সেন্টারের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান খালেদ ইউসাফ বলেন, "মিসর ও মালয়েশিয়া শরী'আহ্ আইন বেশ উদারভাবে ব্যাখ্যা করে । অন্যদিকে, সৌদি আরব ও কুয়েত বেশ কঠোর । দুবাই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে ।"[৮৭]

ব্যাংকের শরী'আহ্ বোর্ডগুলো গঠনের জন্য বিশ্ব অর্থায়নের জ্ঞানসম্পন্ন প্রশিক্ষিত ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদের বেশ অভাব রয়েছে । এটা এই শিল্পের একটি বড় অসুবিধা ।[৮৮] এমনকি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী অর্থায়ন শিল্প বোঝেন এমন পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদও নেই ।[৮৯] শরী'আহ্সম্মত আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট-এর জন্য কোনো মাধ্যমিক বাজারের অভাবও একটি বাধা । ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিনান্সিয়াল মার্কেট এ ধরনের একটি বাজার উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ।[৯০]

৬. উপসংহার

বর্তমানপর্যায়ে, অন্তত নিকট ভবিষ্যতে ইসলামী অর্থায়ন/ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য অর্থায়ন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয় । একটি ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য মুসলিম দেশগুলোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামী ব্যবস্থায় রূপান্তরের জন্য সত্যিকার অঙ্গীকার থাকতে হবে । এটা বেশ কঠিন । কারণ, বেশিরভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পশ্চিমা ধাঁচের আর্থিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা পেয়ে

---

৮৩ প্রাগুক্ত ।

৮৪ পারস্পরিক আত্মরক্ষার লক্ষ্যে গঠিত হয় উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ । এর সদস্যদেশগুলো হচ্ছে বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ।

৮৫ অনিতা হাওসের, *"Profits With Principles",* গ্লোবাল ফিন্যান্স, জুলাই/আগস্ট, ২০০৬, পৃ: ২৫ ।

৮৬ লালেহ বখতিয়ার, *Encyclopedia of Islamic Law: A Compendium of the Major Schools,* এবিসি ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ, ইনক, শিকাগো, ১৯৯৬ ।

৮৭ অনিতা হাওসের, *"Profits With Principles",* গ্লোবাল ফিন্যান্স, জুলাই/আগস্ট, ২০০৬, পৃ: ২৫ ।

৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪ ।

৮৯ জুবায়ের, হাসান, *"Islamic Finance Education at Graduate Level: Current Positions and Challenges",* মিউনিখ পার্সোনাল *RePEc* আর্কাইভ, পেপার নং ৮৭১২, মে ২০০৮ । দেখুন: *http//mpra.ub.uni-muenchen.de/8712/*

৯০ প্রাগুক্ত ।

গেছে এবং এগুলো আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং মান-অনুবর্তী। তা ছাড়া, এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার মূলে যেহেতু রাষ্ট্র, তাই এই পদ্ধতি পশ্চিমা দেশগুলোতে রফতানি করা যাবে বলেও আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে না।

সাব-প্রাইম মর্টগেজ ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং খাতে সঙ্কট ইসলামী আর্থিক সেবা শিল্পের ক্ষেত্রেও নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করবে। সাব-প্রাইম গ্রাহক হলেন তারা যাদের ঋণযোগ্যতা নানা কারণে প্রশ্নবিদ্ধ। তারদেরকে ঋণ দিতে গিয়ে ঋণদাতা যে ঝুঁকি গ্রহণ করে তা অনেক বড়। তাই তাদের বেলায় সুদের হার ও ঋণের জামিনও গতানুগতিকের চেয়ে অনেক বেশি। বাড়ি বন্ধকী ঋণ খাতে সাধারণত সাব-প্রাইম ঋণ দেয়া হয়।[৯১] এই ধাক্কার কারণে সার্বিকভাবে বন্ধকী-যুক্ত অর্থায়ন বেশ কঠিন হয়ে গেছে। এর ফলে অনেক বাজারে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন খাতে ধস নামে। অনেকে মনে করেন এই সঙ্কট ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে জোরদার করবে[৯২] এবং তাতে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।[৯৩] ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ক্রেডিট মার্কেট লস ছিল ৮০ বিলিয়ন ডলারের মতো।[৯৪] অন্য দিকে, বাহরাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর রাশেদ আল-মারাজ জানান উপসাগরীয় ও মালয়েশিয়ার ইসলামী আর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর তেমন কোনো লোকসান হয়নি।[৯৫]

আল-মারাজ এর মতে, এর একটি কারণ হলো ইসলাম সুদের ওপর ঋণ দেয়া এবং ঋণ কেনাবেচা নিষিদ্ধ করেছে। তাই 'কোলেটারালাইজড ডেট অবলিগেশন'-এর মতো জটিল কোনো বিষয় ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থায় নেই।[৯৬] মুসলিম ব্যাংকাররা এখন প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম এমন অর্থায়ন কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।[৯৭] এখন প্রশ্ন হলো ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো কি সাব-প্রাইম ঋণবাজার দখল করতে সক্ষম হবে? তারা কি আগবাড়িয়ে ওইসব ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ কাঁধে নেবে? তা নাহলে সাব-প্রাইম সঙ্কট থেকে মুক্তি বা ইসলামী ব্যাংকগুলোর মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধি কিছুটা কঠিন হবে।

---

৯১ এরিক প্যাটরুফ, *"How Will the Subprime Mess Impact You?"*, ইনভেস্টোপেডিয়া, *http://www.investopedia.com/articles/pf/07/subprime-impact.asp.*

৯২ দেখুন, *"Islamic Banks Give London World Financial Clout"*, ৬ মার্চ ২০০৮। *http://www.msnbc.msn.com/id/23505646/;* দ্য ইকনমিক টাইমস, ৩ ডিসেম্বর ২০০৭, *http://economictimes.indiatimes.com/Interview/All_Arabs_will_prefer_Islamic_banking/articleshow/2590419.cms; "Islamic Banks Withstand Mortgage Crisis"*, কনসালটি মুয়ামালা, *http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2008/02/08/islamic-banks-withstand-mortgage-crisis/.*

৯৩ *"Islamic Banks Shielded From Subprime"*, রয়টার্স, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। *http://www.reuters.com/article/managerViews/idUSNOA43244920080204.*

৯৪ অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন পরিষদ (ওইসিডি) মনে করে যে এটা ৩০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হতে পারে। নিউ ইয়র্ক টাইমস, ২৩ নভেম্বর, ২০০৭, *http://www.nytimes.com/2007/11/23/business/23oecd.html?ref=worldbusiness.*

৯৫ প্রাগুক্ত।

৯৬ প্রাগুক্ত।

৯৭ ফুটনোট ৭৭ ও ৭৮ দেখুন।

মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী ব্যাংকগুলো বর্তমানে মূলত আর্থিক সেবা ও পণ্যের আকারে ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে। এই ধারা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সত্যিকার অর্থে বৈশ্বিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিণত করবে না। বড়জোর একটি বিশেষায়িত ব্যাংকিং সেবা ও পণ্যের মতো এর উন্নয়ন ঘটতে পারে। মূলত পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সমর্থনে ইসলামী বা শরী'আহ্সম্মত ব্যাংকিং বৈশ্বিক ব্যাংকিং মার্কেট-এর একটি ক্ষুদ্র অংশ হয়ে থেকে যাবে বলে মনে হচ্ছে।[৯৮] শিল্পোন্নত দেশগুলো ইসলামী ব্যাংকগুলোকে গতানুগতিক ব্যবস্থার মতোই আরেকটি প্রতিযোগী হিসেবে মনে করতে পারে।[৯৯] এমন অনেকে আছেন যারা মনে করেন এই শিল্প এখনো শৈশবের পর্যায়ে এবং বৃহৎ আর্থিক বিশ্বে জুতসইভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার মতো পরিপক্বতা লাভ করেনি। ফলে এর প্রয়োজন সুরক্ষা, প্রতিযোগিতা নয়।[১০০] তাই, ইসলামী ব্যাংকিং শিল্প আসলেই একটি বৈশ্বিক পদ্ধতিতে পরিণত হচ্ছে কি না সে প্রশ্ন উঠলে প্রথম যে উত্তরটি আসতে হবে তা হলো, বিশ্বায়ন বলতে আমরা কি বুঝি। মধ্যপ্রাচ্য কিংবা মুসলিম দেশগুলো, এমনকি পশ্চিমা শিল্পোন্নত কয়েকটি দেশে ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার বিস্তার ঘটলেও এই পদ্ধতি এখনো প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থার জন্য কোনো প্রতিযোগিতামূলক হুমকি সৃষ্টি করেনি বা কোনো বড় বিকল্প হয়ে ওঠেনি। এটি এখনো শিক্ষানবিস অবস্থায় - বিকল্প হয়ে ওঠা সময়সাপেক্ষ।

অনুবাদ : মাসুমুর রহমান খলিলী

---

৯৮ রেহমান, শেহেরাজাদে, *"Globalization of Islamic Finance Law",* উইসকনসিন ইন্টারন্যাশনাল ল' জার্নাল, স্প্রিং ২০০৮।

৯৯ হাওয়ার্ড ডেভিস, চেয়ারম্যান, ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটি, সেমিনার অন ইসলামিক ফিন্যান্স, হিল্টন হোটেল, লিচেস্টার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০২, *www.fsa.gov.uk.*

১০০ হাসান জুবায়ের, *"Islamic Finance Education at Graduate Level: Current Positions and Challenges",* মিউনিখ পার্সোনাল *RePEc* আর্কাইভ, পেপার নং ৮৭১২, মে ২০০৮। *http//mpra.ub.uni-muenchen.de/8712/*

তথ্যসূত্র

"সব আরবের পছন্দ ইসলামী ব্যাংকিং", *The Economic Times,* ৩ ডিসেম্বর, ২০০৭ ।

"প্রচলিত তবে অন্য কিছু?" [ইসলামিক ব্যাংকিং], *Banker Middle East (CPI Financial),* সংখ্যা ৪৩, জানুয়ারি ২০০৪ ।

আরিফ, মোহাম্মদ, "ইসলামিক ব্যাংকিং", *Asian-Pacific Economic Literature,* খণ্ড ২, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ।

আর্মস্ট্রং, কারেন, *A History of God, Ballantine Books,* নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৩ ।

বখতিয়ার, লালেহ, *Encyclopedia of Islamic Law: A Compendium of the Major Schools,* এবিসি ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ, ইনক, শিকাগো, ১৯৯৬ ।

ডেভিস, হাওয়ার্ড, চেয়ারম্যান, ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটি, লিচেস্টারের হিল্টন হোটেলে ইসলামিক ফিন্যান্স-এর ওপর বক্তৃতা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০২ ।

দই, আব্দুর রহমান আই, *Shari'ah: The Islamic Law,* তাহা পাবলিশার্স লি., লন্ডন, ১৯৮৪, পৃঃ ২৭৫-২৭৮ ।

এরিকো, লুকা ও মিত্র ফারাবখশ, *"Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision",* আইএমএফ ওয়ার্কিং পেপার, ১৯৯৮, ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ), মার্চ ১৯৯৮ ।

এল-ফাকহানি, সাইদ ও এম. কবির হাসান, *"Performance of Islamic Mutual Funds",* ইকনমিক রিসার্চ ফোরাম, ১২তম বার্ষিক সম্মেলন, কায়রো, মিসর, ডিসেম্বর ২০০৫ ।

এল-গামাল, মাহমুদ এ. *"Interest and the Paradox of Contemporary Islamic Law and Finance",* ফোর্ডহ্যাম ইন্টারন্যাশনাল ল' জার্নাল, খণ্ড ২৭, ডিসেম্বর ২০০৩ ।

এল কুরশি, মোহাম্মেদ, *"Islamic Finance Gears Up",* ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, খণ্ড ৪২, সংখ্যা ৪, আইএমএফ, ডিসেম্বর, ২০০৫ ।

ফার্স্ট কোয়ার্টার রিপোর্ট ২০০৮, ৬ মে ২০০৮, ইউএসবি ফিন্যান্সিয়াল হাইলাইটস । *"Government Mulls Issuing Islamic Bonds",* রয়টার্স নিউজ, ইউকে, এপ্রিল ২৩, ২০০৭ ।

"Guidance Note in connection with the Capital Adequacy Standard: Recognition of Ratings by External Credit Assessment Institutions (ECAIs) on Shari'ah-Compliant Instruments", ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড, মার্চ ২০০৮ ।

হার্পার, ডেভিড, *"Basel II Accord to Guard Against Financial Shocks",* ইনভেস্টোপেডিয়া, ২০০৭ ।

হাওসের, অনিতা, *"Profits With Principles",* গ্লোবাল ফিন্যান্স, জুলাই/আগস্ট, ২০০৬ ।

"Islamic Financial Institutions Awards 2008", অ্যানুয়াল সার্ভে : ইসলামিক ফিন্যান্স, গ্লোবাল ফিন্যান্স, জুন ২০০৮ ।

"Islamic Banks Give London World Financial Clout", ৬ মার্চ ২০০৮ ।

"Islamic Banks Shielded From Subprime", রয়টার্স, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ ।

"Islamic Finance Market Turns to Securitization", ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল ল' রিভিউ, লন্ডন, জুলাই ২০০৫ ।

ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল আউটলুক ২০০৬ : ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস রেটিংস, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস, সেপ্টেম্বর ২০০৭ ।

নাইট, ম্যালকম ডি. *"The Growing Importance of Islamic Finance in the Global Financial System",* ৬ ডিসেম্বর ২০০৭, ফ্রাঙ্কফুর্টে ২য় ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড ফোরামে দেয়া বক্তৃতা।

ম্যাক শেলি, উইল অ্যান্ড শান্তি নাম্বিয়ার, ব্লুমবার্গ নিউজ আর্টিকেল, *"Islamic Bond Fatwas Surge on Million-Dollar Scholars",* ১ মে, ২০০৭।

মুরাতা, সাচিকো এবং উইলিয়াম সি. চিত্তিক, *The Vision of Islam,* প্যারাগন হাউজ, সেন্ট পল, মিনেসোটা, ১৯৯৪।

মুয়ামারা, কনসালতাসি, *"Islamic Banks Withstand Mortgage Crisis", http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2008/02/08/islamic-banks-withstand-mortgage-crisis/.*

নাসের, সাইয়্যেদ হোসেইন, *Ideals and Realities of Islam,* এবিসি ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ, ইনক, শিকাগো, ২০০০।

পেরি, ফ্রেডারিক ভি. *"Shari'ah, Islamic Law and Arab Business Ethics",* দ্য কানেকটিকাট জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ল', খণ্ড ২২, সংখ্যা ১, স্প্রিং ২০০৭।

প্যাটরুফ, এরিক, *"How Will the Subprime Mess Impact You?",* ইনভেস্টোপেডিয়া, *http://www.investopedia.com/articles/pf/07/subprime-impact.asp.*

রেহমান, শেহেরাজাদে, *"Globalization of Islamic Finance Law",* উইসকনসিন ইন্টারন্যাশনাল ল' জার্নাল, স্প্রিং ২০০৮।

রেহমান, শেহেরাজাদে ও হোসেইন আশকারি, *"Islamicity Index (I2): How Islamic Are Islamic Countries?",* গ্লোবাল ইকনোমি জার্নাল, খণ্ড ১১, সংখ্যা ২, মে ২০১০।

রেহমান, শেহেরাজাদে ও হোসেইন আশকারি, *An Economic IslamicityIndex (E2)",* গ্লোবাল ইকনোমি জার্নাল, খণ্ড ১২, সংখ্যা ৩, অক্টোবর ২০১০।

শস, জোসেফ, *An Introduction to Islamic Law,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৮২।

শেনিয়াওয়াস্কি, বারবারা এল. *"Riba Today: Social Equity, the Economy, and Doing Business Under Islamic Law",* কলম্বিয়া জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ল', খণ্ড ২৯, ২০০১।

রুটলেজ, উইলিয়াম এল. ২০০৫ সালের ১৯ এপ্রিল নিউ ইয়র্কে 'আরব ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা' (এবিএএনএ) আয়োজিত *"Islamic Finance: Players, Products & Innovation in NY City"* শীর্ষক সম্মেলনে দেয়া বক্তব্য।

বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্বব্যাংকের উপাত্ত, ওয়াশিংটন ডিসি, ২০০৬।

জুবায়ের, হাসান, *"Islamic Finance Education at Graduate Level: Current Positions and Challenges",* মিউনিখ পার্সোনাল *RePEc* আর্কাইভ, পেপার নং ৮৭১২, মে ২০০৮।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা : ব্যবসায়িক ঝুঁকিতে অংশীদারিত্ব

ড. নিসার আহমদ

সারমর্ম

মুসলমানরা কেন প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংকিং-এর দিকে ঝুঁকছে তা খতিয়ে দেখা এ লেখার উদ্দেশ্য। যেসব মুসলমান এখনো মনে করেন ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সুদ (রিবা) থেকে মুক্ত নয় তাদের মন-মগজ থেকে সবরকম সন্দেহ-সংশয় দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। এই গবেষণার অভিসন্ধি বা পদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক এবং এর উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে এ বিষয়ের ওপর বিভিন্ন গবেষণাপত্র থেকে। একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে এই গবেষণায় মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যেই যে সবচেয়ে ভালো সমাধান নিহিত, সে বিষয়ে মুসলমানদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে এই গবেষণা বেশ সহায়ক হবে। পরিশেষে, দেখানো হয়েছে ব্যবসায় চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক সঙ্কটের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি প্রশমনে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা অধিকতর নিরাপত্তা দেয় এবং ব্যর্থতার আশঙ্কা কমিয়ে আনে।

১. সূচনা

বর্তমান যুগে ব্যাংকিং ব্যবস্থা দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমাজে সব ধরনের আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হলে তা দেশ পরিচালনাকারীদের পক্ষে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য অধিক ফলপ্রসূ আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে সহায়ক হয়।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। ব্যাংকিং পদ্ধতি এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেন সম্পদ আয়কারীরা লাভ বা মুনাফার বিনিময়ে তাঁদের সঞ্চয় ব্যাংকে আমানত রাখেন। এই মুনাফায় তাদেরকে মুদ্রাস্ফীতির লোকসান কাটিয়ে আয় হিসেবে কিছুটা বাড়তি লাভ দেয়া হয়। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন এটা সঞ্চয়কারীদের একটি বৈধ আয় এবং একে অবশ্যই একটি ব্যবসায়িক নৈবেদ্য (proposition) হিসেবে গণ্য করতে হবে। আসলে ব্যাংক হলো সেবার জোগানদাতা এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আয় করা। তবে, মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় লেনদেন করতে গিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তিতে পড়েন।

ড. নিসার আহমদ, ডিন, ফ্যাকাল্টি অব ইকনমিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স, মিনহাজ ইউনিভার্সিটি লাহোর, পাকিস্তান।

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় আমানতকারীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ এবং তা বিনিয়োগকারীদের ধার দেয়ার পেছনে মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে সুদ। ব্যাংক যদিও তহবিল স্থানান্তর, সিকিউরিটি ও গ্যারান্টি, ক্রেডিট নোট ও মুদ্রা বিনিময়সহ আরো অনেক কাজ করে এবং সেগুলো থেকে ব্যাংকের আয়ের একটি বড় অংশ আসে কিন্তু এগুলোকে মূলত ব্যাংকের সম্পূরক কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আসলে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য। সুদ লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য নিয়েই এটি সাজানো হয়েছে, যা ইসলামসহ অন্যান্য ঐশী ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা শরী'আহ্‌র (ইসলামী আইন) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেবার প্রস্তাব দিয়ে থাকে। অর্থ গ্রহণ বা প্রদানের ক্ষেত্রে সুদের লেনদেন জড়িত এমন সব ধরনের কর্মকাণ্ড শরী'আহ্‌ নিষিদ্ধ করেছে। আবার ইসলামী আইন অনুযায়ী, ব্যবসায়িক ঝুঁকি রয়েছে এমন লেনদেনের ক্ষেত্রে লাভ ও লোকসান ভাগাভাগি করে নেয়া পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত ইসলামী শরী'আহ্‌ নীতিকে অনুসরণ করে চলে যার দাবি সবার জন্য ন্যায়বিচার। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না, কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না" (২:২৭৯)। এই নীতিতে সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং বিশ্বের সকল সমাজেই তা সমাদৃত।

বিগত আর্থিক সঙ্কট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা অসমর্থ হওয়ায় সরকারি ও প্রচলিত উভয় ধরনের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে এই শিল্পের একটি প্রতিযোগী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। যাত্রা শুরুর পর থেকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অত্যন্ত উঁচুমাপের প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হওয়া এর আংশিক কারণ।

এ গবেষণায় প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার সবচেয়ে ভালো সমাধান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং চালুর একটি যৌক্তিক কাঠামো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ অনুসরণের মাধ্যমে ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড জোরদারের পাশাপাশি ব্যাংকের প্রতিটি আর্থিক লেনদেনে ঝুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কার্যক্রম জোরদার।

২. রচনাদি পর্যালোচনা (ঐতিহাসিক ঘটনাবলি)

পশ্চিমা বাণিজ্যিক (প্রচলিত) ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় প্রায় আড়াই শ' বছর আগে। প্রথম দিকে সাধারণভাবে মনে করা হতো, আল-কুরআনে যে 'রিবা'র কথা বলা হয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থায় তার কোনো উপাদান নেই। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ দায়ী। বিশেষ করে শরী'আহ্‌ আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা, শিক্ষার নিম্নমান এবং ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর আধিপত্যের কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কর্মপ্রকৃতি সম্পর্কে বেশিরভাগ মুসলিম দেশ ছিল অসচেতন।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা ক্রমাগত বিস্তৃত হয় এবং ক্রমেই অধিক সংখ্যক মানুষ এই সেবা গ্রহণ শুরু করে। ঊনবিংশ শতকের দিকে ধর্মীয় বিষয়ে পণ্ডিত এমন বেশ কিছু ব্যক্তি বাণিজ্যিক ব্যাংকের লেনদেন ও সেবাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পান, ব্যাংকগুলো ভোক্তাদের যে ঋণ দেয় তা পরিশোধ করতে গিয়ে গ্রাহক প্রায়ই কঠিন সমস্যায় পড়ছে। অশেষ দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে তাকে। এটা শরী'আহ্ আইনে উল্লিখিত 'রিবা'র অনুরূপ।

১৯২৯ সালের মহামন্দার পর ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারে প্রান্তিক চাহিদা নিয়ে কাজ করছিল। তখন ব্যাংকগুলো ডলার প্রতি আমানতের বিপরীতে ৯ ডলার পর্যন্ত ঋণ দিতে শুরু করে। ফলে যখন মার্কেটের পতন ঘটে তখন ব্যাংকগুলো তাদের দেয়া ঋণ ফেরত আনার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রাপ্তির হার ছিল অত্যন্ত নিচু। ঋণগ্রহীতারা খেলাপি হয়ে পড়লে ব্যাংকগুলোর পতন শুরু হয় এবং আমনতকারীরা সঞ্চয় তুলে নিতে একযোগে ব্যাংকের দিকে ধাবিত হয়। সৃষ্টি হয় আতঙ্ক যার পরিণতিতে ৯ হাজারের বেশি ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩০-এর দশকে ব্যাংকব্যবস্থার এই বড় ধরনের ব্যর্থতা সামাল দিতে বহু দেশ তড়িঘড়ি করে আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম দেখভাল করার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতিগুলোকে স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে জন্ম হয় আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) ও ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকন্সট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইবিআরডি)।

১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম পর্যালোচনা করে ওহালেন (১৯৯১) দেখতে পান, তারল্য যত কমতে থাকে ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যর্থতার ঝুঁকি তত বেড়ে যায়। তার গবেষণায় দেখা যায় যে উচ্চ ঋণ/অ্যাসেট রেশিও, উচ্চ পরিচালনা ব্যয় এবং উচ্চতর পারফর্মিং লোন রেশিও নিরাপদপর্যায়ে রাখা না গেলে ব্যাংকিং ব্যর্থতার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। দুর্বল ঋণগ্রহীতাদের বন্ধকী ধার দেয়ায় ২০০৭ সালে বিশ্বজুড়ে আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। এই সঙ্কটের শুরু মূলত যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যেহেতু ওই সময়ের মধ্যে ব্যাংকিং শিল্পে অতিমাত্রায় বিশ্বায়ন ঘটে গেছে, তাই বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ওই সঙ্কটের ধাক্কা লাগে। এতে পৃথিবীজুড়ে বহু আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুখথুবড়ে পড়ে। বহুসংখ্যক বড় আকারের ব্যাংক দেউলিয়াত্বের সম্মুখীন হলে সরকার ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পর্যাপ্ত উদ্ধার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম চলে আসছে। তখন বণিকরা লাভের বিনিময়ে আসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়া অঞ্চলের নগরে নগরে পণ্যের ফেরিওয়ালা ও কৃষকদের ঋণ দিত। তবে আধুনিক কালে আমরা যে ব্যাংক ব্যবস্থা দেখি তার জন্ম মধ্যযুগে ইতালীয় রেনেসাঁর প্রথম দিকে। প্রাচীন গ্রিস ও রোম সাম্রাজ্যের যুগে একশ্রেণীর ঋণদাতা মন্দিরকে কেন্দ্র করে মানুষকে ঋণ দেয়া এবং আমানত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করত। যদিও পরবর্তী যুগে ব্যাংক ব্যবস্থা ব্যবসায়িক মডেলের সূক্ষ্ম-শর্তগুলো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যায়। ব্যাংকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ঋণ দেয়া ও সংগ্রহ

এবং আমানতের সুরক্ষা করা। ই-ব্যাংকিংসহ প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বহুরকম পরিবর্তন ঘটলেও এর মৌলিক কার্যক্রম ভবিষ্যতে একই থেকে যাবে বলে ধারণা করা যায়।

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আর্থিক অস্থিতিশীলতার মতো কিছু সহজাত ঝুঁকির কারণে গ্রাহকদের মাঝে বিকল্প ব্যবসায় মডেল অনুসন্ধানের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইসলামী ব্যাংকিং-এর নৈতিক আবেদনের কারণে তা প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অটলভাবে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে মুসলিম বিনিয়োগকারীরাও (মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল) তাদের পোর্টফোলিও-তে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাই কেবল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেই নয়; যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের মতো মুসলিম সংখ্যালঘু দেশগুলোতেও ইসলামী ব্যাংকিং দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৬৫টি দেশে প্রায় পাঁচ শতাধিক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এ যাবতকাল ইসলামী ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০-১৫ শতাংশের মতো এবং এই প্রবৃদ্ধি আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর চর্চা অনেকটা আধুনিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার মতো হলেও এটা ইসলামী শরী'আহ্ আরোপিত কতিপয় বিধিনিষেধের মধ্যে থেকে পরিচালিত হয়। এসব বিধিনিষেধের মধ্যে রয়েছে :

প্রথমত, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহককে তহবিল ধার দেয়ার বিনিময়ে ইসলামী ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করে তা পূর্বনির্ধারিত নয়।

দ্বিতীয়ত, ধার প্রদানকারী যে সুবিধা লাভ করবে তা হবে ধার গ্রহণকারীর সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনের ফলে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ।

তৃতীয়ত, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ব্যক্তিকে পাওনাদার হিসেবে গণ্য করা হয় না, কোনো উদ্যোগের (undertaking) সঙ্গে যুক্ত থাকেন তিনি।

চতুর্থত, ইসলামী ব্যাংকিং-এ রিবা (সুদ) গ্রহণ নিষিদ্ধ।

পঞ্চমত, চুক্তিগত অনিশ্চয়তা ও জুয়া (ঘারার ও মাইসির) ইসলামী ব্যাংকিংয়ে অবৈধ।

ষষ্ঠত, নিষিদ্ধ শিল্প (যেমন শুকরজাতীয় পণ্য, অ্যালকোহল, জুয়া) হারাম হিসেবে বিবেচিত এবং এগুলো ইসলামী ব্যাংকিংয়ে অনুমোদিত নয়।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর লেনদেনে সুদের ধারণা নিষিদ্ধ হলেও এতে অর্থের সময়জনিত মূল্যকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। আসলে এটি অর্থায়নকারীকে তার অর্থের মাধ্যমে একটি উপযুক্ত আয় থেকে সুবিধাদানের প্রস্তাব করে। ইসলাম মানুষকে রিবা (সুদ) সংশ্লিষ্ট সব ধরনের লেনদেন থেকে বিরত রাখে। খান-এর মতে (২০১২), ইসলামী ব্যাংক ঋণগ্রহণকারীকে অর্থ ধার দেয় লাভ-লোকসান ভাগাভাগি করে নেয়ার ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংকের লেনদেনগুলো বাস্তব সম্পদ-সমর্থিত এবং এর সহায়ক হয়ে থাকে।

প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম তুলনা করতে ইতঃপূর্বে আরো গবেষণা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত পাওয়া না যাওয়ায় এমন গবেষণার সংখ্যা খুবই কম এবং এগুলোর পরিসরও বেশ সীমিত। এরপরও গবেষকদের কাছ থেকে যেসব সুচিন্তিত অভিমত পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

পরাশর ও ভেঙ্কটেশ (২০১০), ২০০৬-২০০৯ সালের মধ্যে উপসাগরীয় অঞ্চলের (জিসিসি) ৬টি ইসলামী ও ৬টি প্রচলিত ব্যাংকের কার্যক্রমের ওপর তুলনামূলক গবেষণা করেন। পারফরম্যান্স বিচারের সূচকগুলোর মধ্যে ছিল ক্যাপিটাল-অ্যাসেট রেশিও, কস্ট-টু-ইনকাম রেশিও, রিটার্ন অন এভারেজ অ্যাসেট, রিটার্ন অন অ্যাভারেজ ইকুইটি, মোট অ্যাসেটের ওপর ইকুইটি এবং মোট অ্যাসেটের ওপর লিকুইড অ্যাসেট। গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায়, ২০০৬-২০০৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আরব উপসাগরীয় অঞ্চলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর পারফরম্যান্স সব দিক দিয়েই প্রচলিত ব্যাংকগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে।

২০০৬-২০০৯ সালের মধ্যে পাকিস্তানে ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর পারফরম্যান্স তুলনা করে একই ধরনের গবেষণা করেন আনসারি ও রেহমান (২০১১)। গবেষকদ্বয় বেশ কিছু আর্থিক রেশিওর প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, লাভজনকতা (profitability), তারল্য, ঝুঁকি ও সচ্ছলতা, পুঁজির পর্যাপ্ততা (capital adequacy), ডেপ্লয়মেন্ট রেশিও এবং পরিচালনাগত দক্ষতা।

আলকাস্টের (২০১২)-এর লেখক পাপ্পাশা, ইজ্জেলদিন ও ফুয়েরতেস্ব ১৯৯৫-২০১০ সময়ের মধ্যে ৪২১টি ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকের ব্যর্থতার বিপত্তিগুলো নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা করেন। তারা দেখতে পান যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলক নিচুপর্যায়ের এবং এগুলোর আন্তঃসংযুক্তি কম। এতে সম্মিলিতভাবে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন গবেষক দলের সদস্য বেক, কান্ট এবং মেরুশে (২০১০) তাদের "ইসলামী বনাম প্রচলিত ব্যাংকিং : ব্যবসা মডেল, দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা" শীর্ষক গবেষণার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ব্যবসায়িক ওরিয়েন্টেশন, দক্ষতা, সম্পদের মান ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। তবে, ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় অনেক বেশি মূল্যসাশ্রয়ী। গবেষণার মাধ্যমে তারা ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্রমাগত উচ্চ 'ক্যাপিটালাইজেশন'-এর প্রমাণ পান। সঙ্কটকালে ইসলামী ব্যাংকগুলো কেন তুলনামূলক ভালো দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়, এই 'ক্যাপিটাল কুশন' ও উচ্চতর 'লিকুইডিটি রিজার্ভ' থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

৩. গবেষণা পদ্ধতি ও পরিকল্পনা

এই গবেষণায় ইসলামে 'রিবা' (সুদ)-র ধারণা এবং প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মুসলিম জনগণের ওপর 'রিবা'র প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা খুঁজে বের করাই এর লক্ষ্য। সাধারণভাবে যারা ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করছেন তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা পুরোপুরি 'রিবা'মুক্ত নয় বলে মুলমানদের মনে যে সামান্য সন্দেহ-সংশয় রয়েছে তা দূর করা এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। এটা একটি বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা। একই বিষয়ে ইতঃপূর্বে লিখিত বিভিন্ন গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে এর সমর্থনে ক্ষেত্রবিশেষে মাধ্যমিক উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. আলোচনা ও বিশ্লেষণ

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি প্রগতিশীল ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। ইসলামের একেবারে ঊষালগ্নে এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার উৎপত্তি। মহানবী (সা.) তার স্ত্রী হযরত খাদিজার পক্ষে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এটা ছিল অংশীদারিত্বের একটি সত্যিকার রূপ। এখানে মালিক পুঁজি সরবরাহ করেন এবং নবী (সা.) শ্রম ও ব্যবস্থাপনা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন। প্রত্যেক পক্ষ একটি সম্মত ও পূর্ব-নির্ধারিত হিসাবের ভিত্তিতে লাভ-লোকসান ভাগ করে নিতে রাজি হন। বর্তমান বিশ্বে ১৬০ কোটি মুসলমান রয়েছে। এদের প্রায় ৬২ শতাংশ বাস করেন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়, মোটামুটি ২০ শতাংশের বাস মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকা এবং ১৫ শতাংশ সাব-সাহরান আফ্রিকায়। আর, ইউরোপ ও আমেরিকায় ৩% মুসলমানের বাস। ভারত ও পাকিস্তানে যত মুসলমান বাস করেন (প্রায় সাড়ে ৩৪ কোটি) তাদের সংখ্যা পুরো মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের চেয়ে বেশি। বেশিরভাগ মুসলমান চান যে তাদের ব্যাংকিং প্রয়োজনগুলো পুরোপুরি ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পূরণ হোক।

প্রথম দিকে, মুসলিম বিশ্বে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হতো যে বাণিজ্যিক (প্রচলিত) ব্যাংক ব্যবস্থায় "রিবা"-র কোনো উপাদান নেই। মুসলমানদের মনে এমন ধারণা জন্মানোর পেছনে যেসব উপাদান কাজ করে সেগুলোর মধ্যে রেয়েছে– শিক্ষার নিম্নমান, শরী'আহ্ আইন সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞতা এবং পশ্চিমা শক্তিগুলোর আধিপত্য। ঊনবিংশ শতকে এসে কিছু মুসলিম মনীষী বাণিজ্যিক (প্রচলিত) ব্যাংকগুলোর গ্রাহকসেবার প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পান যে এগুলো যে ঋণ দিচ্ছে মূলত তা দেয়া হচ্ছে ভোগের জন্য। এতে ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে ঋণগ্রহীতা কঠিন সমস্যায় পড়ছেন যার পরিণতিতে তাকে পোহাতে হচ্ছে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লেনদেনের এই প্রকৃতি শরী'আহ্ আইনে উল্লিখিত "রিবা"র একেবারে অনুরূপ।

আল-কুরআনে "রিবা"-র ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এটা হলো ঋণদাতা ঋণগ্রহণকারীর কাছ থেকে মূল অর্থের ওপর সুনির্দিষ্ট হারে যে বাড়তি অর্থ গ্রহণ করে। ইহুদি ধর্ম ও ইসলামে সুদারোপ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। একইভাবে খ্রিষ্টধর্মেও বলা হয়েছে, "অর্থ বা খাদ্য বা এমন কোনো কিছু যা থেকে সুদ পাওয়া যেতে পারে তার জন্য তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ নিয়ো না।" (Deuteronomy ২৩:১৯)

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা হলো ঝুঁকিতে অংশীদারিত্বভিত্তিক। এই ঝুঁকি ব্যবসার একটি অপরিহার্য উপাদান। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা মুনাফায় অংশীদারিত্ব (মুদারাবা), জিম্মাদারি (ওয়াদিয়াহ), যৌথ

উদ্যোগ (মুশারাকা), মূল্য সংযোগ (মুরাবাহা) এবং লিজিং (ইজারা) অনুমোদন করে। এটা প্রমাণিত সত্য যে, শরী'আহ্ আরোপিত সীমারেখার মধ্যে থেকেই ইসলামী ব্যাংকিং আধুনিক প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের মতো কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং সফলতার সঙ্গে বৃহত্তর পরিসরে ব্যবসায়িক প্রয়োজন পূরণ করে চলেছে। নিচে এমন কিছু ব্যবসায়িক লেনদেনের উল্লেখ করা হলো :

১. ইসলামী ব্যাংক অনির্ধারিত মুনাফার বিনিময়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য অর্থ ধার দিতে পারে। এই অনির্ধারিত মুনাফার হার হবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই ঋণ দেয়ার জন্য ব্যাংকের লাভ বা লোকসান হবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লাভ ও লোকসানের নির্দিষ্ট হারের সমান। এ ধরনের লেনদেনকে বলা হয় 'মুশারাকা'।

২. লাভ ও লোকসান ভাগাভাগি হবে এমন শর্তে ইসলামী ব্যাংক শ্রম, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার সামর্থ্য রয়েছে এমন কোনো উদ্যোক্তাকে তহবিল (উদ্যোক্তা পুঁজি) জোগান দিতে পারে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পুঁজি ও শ্রম দক্ষতার মধ্যে এ ধরনের অংশীদারিত্বের যুক্তি হলো ব্যর্থতার পুরো দায়ভার অবশ্যই শুধু অর্থগ্রহীতা বহন করবেন না। এ ধরনের অনুশীলনকে বলা হয় মুদারাবা।

৩. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রায় 'ফুল-রিজার্ভ' অবস্থায় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলো অত্যন্ত উঁচুপর্যায়ের 'রিজার্ভ রেশিও' অর্জন করতে পারে।

৪.১ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যর্থতা

সম্প্রতি (২০০৭ সাল) যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত ধারার বহুসংখ্যক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের মর্টগেজ ও মর্টগেজ-ব্যাকড সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই সঙ্কট বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং আর্থিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণেই মূলত মর্টগেজ সঙ্কটের সৃষ্টি এবং এটা ছিল অতিমাত্রায় ঋণগ্রহণ এবং ত্রুটিপূর্ণ আর্থিক কৌশলের ফল। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ২০০০ সাল-পূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। মর্টগেজ-এর নিম্নহারের কারণে ব্যাংক ঋণের চাহিদা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। পরবর্তীতে আবাসনের মূল্য ব্যাপকভাবে বেড়ে গেলে বাড়ির মালিকরা অতি ধনী হয়ে পড়েন।

তখন বহু মালিক তাদের বাড়িগুলো জামানত হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন এবং তাদের বাড়ির ইকুইটির বিনিময়ে নগদ অর্থ পেতে দ্বিতীয় মর্টগেজ নিতে শুরু করেন। এতে মর্টগেজ সঙ্কট দেখা দেয়। এই পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে এবং বিশ্বজুড়ে আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টি করে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতার কিছু কারণ তুলে ধরেন সিমন্স। তিনি বলেন, আসল ত্রুটি হচ্ছে সঙ্কট যখন সৃষ্টি হলো তখন আয় কমে যায়। তখন রিজার্ভ বাড়াতে ব্যাংকগুলো ঋণ নিতে শুরু করে। অন্য ব্যাংকের ক্ষতি করেই প্রতিটি ব্যাংক এ কাজ করতে থাকে। ফলে অনেক

ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে পড়ে। শত ভাগ রিজার্ভের পক্ষে মত দেন সিমন্স (১৯৪৮)। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে অর্থ সঞ্চালনের ওপর সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। মিল্টন ফ্রেডম্যান (১৯৫৯) তার "আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকাশনায় ফ্রাকশনাল রিজার্ভ-এর কারণে ঋণ সম্প্রসারণ পর্যালোচনাকালে সুপারিশ করেন যে, বিদ্যমান ব্যবস্থা নতুন আরেকটি ব্যবস্থার মাধ্যমে বদলে ফেলতে হবে। নতুন ব্যবস্থায় ১০০ শতাংশ রিজার্ভ সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে। লুইগ ফন মিজেজ, ফ্রেডরিখ এ. হায়েক ও জেমস টোবিন-এর মতো বিংশ শতাব্দীর বহুসংখ্যক স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ একপর্যায়ে এসে ব্যাংকে উত্থাপিত ডিমান্ড ডিপোজিট-এর ওপর ১শ শতাংশ রিজার্ভ সংরক্ষণ পুরোপুরি সমর্থন করেন। অতি সম্প্রতি পোলক (১৯৯৩) তার "কোল্যাটেরালাইজড মানিঃ অ্যান আইডিয়া হুজ টাইম কাম এগেইন" শীর্ষক নিবন্ধে একই ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সমর্থন করেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি হলো : কেবল অর্থে নয়, বাজারমূল্য রয়েছে এমন সম্পদের মাধ্যমেও রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে তা সহজে নগদ অর্থে রূপান্তর ঘটানো যায়।

"সনাতন ব্যাংকিং-এর পতন" শীর্ষক গবেষণাপত্রে এডওয়ার্ড ও মিশকিন (১৯৯৫) যুক্তি দেন যে সনাতন ব্যাংকিং ব্যবস্থার পতন ঘটবে। কারণ, এগুলো ঋণ নেয় এবং 'শর্ট-ডেট ডিপোজিট' ইস্যু করে সেগুলোর তহবিল যোগান দেয়। লেখকদ্বয় মনে করেন, চিরাচরিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা অধিকতর মুনাফার লোভ দেখিয়ে ব্যাংকগুলোকে বড় রকমের ঝুঁকি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে আর্থিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। ব্যাংকগুলো অধিকসংখ্যক ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ গ্রহণ অথবা উচ্চলাভের আশা দেখায় কিন্তু অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ– এমন 'অপ্রচলিত' কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে ওই অবস্থার সৃষ্টি করে।

৪.২ প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার দক্ষতা

এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের দক্ষতা নিয়ে যেসব তুলনামূলক গবেষণা করেছেন সেগুলোতে ব্যবসায়িক ওরিয়েন্টেশন, দক্ষতা, সম্পদের মান বা স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে যে খুব একটা পার্থক্য নেই, তার যথেষ্ট প্রমাণ দেয়া হয়েছে (ওপরের রচনাদি পর্যালোচনা অধ্যায় ২)।

প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকের ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি কম এবং এটা যে তুলনামূলক মূল্যসাশ্রয়ী তার বহু প্রমাণ রয়েছে।

৪.৩ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতার বৈশিষ্ট্য

অভাবগ্রস্তকে ভোগের জন্য অর্থ কর্জ দেয়া অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত কাজ। কোনো প্রত্যাশা ছাড়াই এ কাজ সম্পাদন করতে হবে। অভাবগ্রস্ত বলতে আমরা তাদেরকে বুঝাই, যারা দিনে দু'বেলা অন্নের সংস্থান করতে পারে না (মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করা হয়)। অভাবগ্রস্তকে প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানের প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

পশ্চিমা দেশগুলোতে এ ধরনের অভাবগ্রস্ত মানুষকে ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে সমাজে বেঁচে থাকার জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। তাই ভোগের জন্য তাদের অর্থ কর্জ করতে হয় না।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেশিরভাগ অভাবগ্রস্ত মানুষ দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ ধার করে। সরকারি সহায়তার অভাবে তাঁরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থলগ্নিকারীদের কাছ থেকে বাড়তি অর্থের (উসুরি বা সুদ) বিনিময়ে টাকা কর্জ নেয়। এ ধরনের কর্জ অভাবগ্রস্তদের জন্য নিদারুণ দুর্দশা ও অশেষ দারিদ্র্য সৃষ্টি করে। কেবল ইসলামেই নয়, সকল ঐশী ধর্মে (খ্রিষ্টবাদ ও ইহুদিবাদ) এই উসুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেকোনো আকারেই হোক না কেন সুদ গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম। প্রচলিত ব্যাংকগুলো যেহেতু টাকার কারবারি (dealer of money) এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থ ব্যবহার করতে দেয়ার পুরস্কার হলো সুদ; তাই সেখানে আয় এবং তহবিল খরচ (cost of funds)-এর মুখ্য উৎস হচ্ছে সুদ। যদিও প্রচলিত ব্যাংকগুলো তহবিল স্থানান্তরসহ অন্যান্য মূল্যবান সেবা দিয়ে থাকে কিন্তু তাদের কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় চালিকা শক্তি এই সুদ। ইসলামী আইনে সুদ আরোপ নিষিদ্ধ। তাই ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানদের কাছে তাদের নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

১৯৬৩ সালে মিসরে প্রথম সুদমুক্ত ইসলামিক ব্যাংক (মিট ঘামার সেভিংস ব্যাংক) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ব্যাংক বিশ্বের বহু দেশে সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পথে ছিল একটি অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক শক্তি। তখন থেকে মুসলিম দেশগুলোর পাশাপাশি অনেক অমুসলিম দেশেও দ্রুততার সঙ্গে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ২০০৮ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৯৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আন্তর্জাতিক কেন্দ্র মধ্যপ্রাচ্যের অংশ প্রায় ৮০ শতাংশ এবং বাকি ২০ শতাংশ বাইরের দেশগুলোর।

৪.৪ প্রবণতা সৃষ্টিকারী শক্তিরূপে ইসলামী ব্যাংকিং

১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে বড় বড় প্রাতিষ্ঠানকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়। ১৯৭০ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলন, ১৯৭২ সালে ইজিপশিয়ান স্টাডি, ১৯৭৬ সালে মক্কায় ইসলামী অর্থনীতির ওপর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ১৯৭৭ সালে লন্ডনে আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থনীতি সম্মেলনগুলো ছিল এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারগুলোর মধ্যে মেলবন্ধনের সহায়ক কার্যক্রম। এর মধ্য দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর তাত্ত্বিক ধারণা ব্যবহারিক দিকে ঘুরে যায় এবং প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। যার ফলস্বরূপ ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তঃসরকারি ব্যাংক - ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি)।

দ্য ব্যাংকার (নভেম্বর ২০১০) বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ৫০০ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করে। তালিকার শীর্ষ ১০টি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে সাতটিই ইরানের। ২০০৯ সালে ইরানী ব্যাংকগুলো ছিল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০০ ইসলামী ব্যাংকের মোট সম্পদের মধ্যে ৪০ শতাংশের মালিক। ৪৫.৫ বিলিয়ন

ডলারের সম্পদ নিয়ে তালিকার শীর্ষে ছিল ব্যাংক মেল্লি ইরান। প্রতিটি ৩৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল সৌদি আরবের আল-রাজি ব্যাংক ও ব্যাংক মিল্লাত। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ইসলামী আর্থিক সম্পদের মালিক ইরান, যার মোট মূল্য ২৩৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পশ্চিমা দেশগুলোকেও গন্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছে ইসলামী ব্যাংক এবং সেখানেও এর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ট্রেন্ড নিউজ এজেন্সি (মে ২০১২)-র এক রিপোর্টে বলা হয়, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক অব আজারবাইজানের চেয়ারম্যান ইসলামী ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছেন। এই সম্প্রসারণের আওতায় আসবে রাশিয়া ও কাজাখস্তান এবং একই সঙ্গে আজারবাইজানকে ইসলামী অর্থায়নের আঞ্চলিক 'হাব'-এ পরিণত করা হবে।

বহু পশ্চিমা দেশে ইসলামী ব্যাংক আর্থিক সেবা দানের কাজ শুরু করেছে। সিটি গ্রুপ ও ডয়েশ ব্যাংকের মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলেছে। বিশ্বের ৫৫টি শীর্ষস্থানীয় আর্থিক ব্যবস্থা ও পুঁজি বাজারের (ওয়ার্ল্ড ই ইকনোমিক ফোরাম) মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়া ইসলামী ব্যাংকিং প্রবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে জনগণের মধ্যে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়া ব্যাংক এবং ওয়েস্টপ্যাক গ্রাহকদের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে। অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম ইসলামী অর্থায়ন বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করেছে 'লা ট্রবি বিশ্ববিদ্যালয়'। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। যেহেতু তেল-রফতানিকারক দেশগুলোর কাছে সম্পদ জমা হতে থাকবে, তাই সেই সম্পদের জন্য আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলবে।

৫. উপসংহার ও সুপারিশ

ইসলামী আইন অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ। তাই বিশ্বব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায় 'রিবা' সংক্রান্ত লেনদেন প্রত্যাখ্যান করতে চায়। এমনকি যেখানে 'রিবা'র উপস্থিতি চিহ্নিত করা দুরূহ, সেক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেন করা ভালো। যেন নিজেরাই নিজেদের আর্থিক কার্যক্রমকে যত দূর সম্ভব 'রিবা' থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কোনো মুসলমান প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যাংকিং লেনদেন করলে নিষিদ্ধ 'রিবা' (সুদ) নিয়ে লেনদেনের জন্য পুরোপুরি তিনিই দায়ী থাকবেন। এটা হবে তার নিজের দ্বারা ইসলামী আইন লঙ্ঘন। এমনকি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কোনো এক পর্যায়ে এসে যদি মনে হয় 'রিবা' এড়ানোর কোনো উপায় নেই, তখন এমন পাপপূর্ণ লেনদেনের জন্য ইসলামী প্রতিষ্ঠানকেই দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বে বর্তমানে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬০ কোটি। তাদের বেশিরভাগ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় লেনদেনে 'রিবা' এড়িয়ে চলতে চান। ২০০৮ সাল নাগাদ ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্পদ ৯৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। এই সম্পদের বেশিরভাগ মধ্যপ্রাচ্য ও ইরানে। বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে ৭টিই ইরানের। কেবল দক্ষতার ভিত্তিতেই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মাঝে জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে।

অতীতে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা বহুসংখ্যক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে। ১৯২৯-৩০ সালের মন্দার সময় প্রায় ৯ হাজার ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়। ২০০৭ সালে 'মর্টগেজ লেন্ডিং' বিশ্বজুড়ে আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টি করে। তাই প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আর্থিক অস্থিতিশীলতার সহজাত ঝুঁকি থাকায় আমানতকারীদের মাঝে বিকল্প ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ ক্রমাগত বাড়ছে। এতে নৈতিক আবেদন ও বৃহত্তর নির্ভরযোগ্যতার কারণে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অনেক বেশি অনুকূল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঝুঁকি ভাগ করে নেয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যা ব্যবসার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একই সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যবসা চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক চ্যালেঞ্জ ও সঙ্কট মোকাবেলার জন্য স্বচ্ছল থাকতে অতি উঁচুপর্যায়ের 'রিজার্ভ রেশিও' সংরক্ষণ করে। এটা ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য খুবই ইতিবাচক একটি বিষয়। এর ফলে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যায়।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মৌলিক অপারেশনাল মডেলটি আমাদের কাছে এমন এক অংশীদারি ব্যবস্থা পেশ করে যেখানে এক পক্ষ তহবিল জোগান দেয় আর, অন্যপক্ষ জোগান দেয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা। তাই, যৌক্তিকভাবে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকিটি এই দুই পরিপূরক কার্যক্রমের মধ্যে কতিপয় সম্মত শর্তাবলির ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যায়।

এটা একটি ন্যায্য ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট সবার জন্য ন্যায়সঙ্গত। অত্যন্ত উঁচুপর্যায়ের 'রিজার্ভ রেশিও' সংরক্ষণের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আমানতকারীদের তহবিলের নিরাপদ জিম্মাদারি নিশ্চিত করে। আমানতকারীরা বিনিয়োগের জন্য তাদের সঞ্চয় ইসলামী ব্যাংকের হাতে তুলে দিচ্ছেন। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে ব্যবসা চক্রের সঙ্কটজনক পর্যায়গুলোতে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বারবার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বেশি বেশি মানুষ তাদের ব্যাংকিং প্রয়োজন পূরণের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বেছে নেয়ার কথা ভাবার পেছনে এটি একটি বড় কারণ।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গবেষক এযাবৎ প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের দক্ষতার পর্যায় নিয়ে যেসব তুলনামূলক গবেষণা করেছেন সেগুলোতে দেখা যায় ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যবসায়িক ঝোঁক, সক্ষমতা, সম্পদের মান বা স্থিতিশীলতার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এর সবগুলো গবেষণাতেই দেখা গেছে যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি কম এবং এগুলো প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চেয়ে মূল্যসাশ্রয়ী।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে এবং বহু পশ্চিমা দেশে এ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে। সিটিগ্রুপ ও ডয়েশ ব্যাংকের মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলো জনগণের চাহিদা পূরণে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিশ্বের ৫৫টি শীর্ষস্থানীয় আর্থিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাজারের (ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম) মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়া ইসলামী ব্যাংকিং প্রবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে জনগণের মধ্যে প্রচারণা

চালিয়ে যাচ্ছে। ন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়া ব্যাংক এবং ওয়েস্টপ্যাক গ্রাহকদের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম ইসলামী অর্থায়ন বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করেছে 'লা ট্রবি বিশ্ববিদ্যালয়'। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। যেহেতু তেলরফতানিকারক দেশগুলোর কাছে সম্পদ জমা হতে থাকবে, তাই সেই সম্পদের জন্য আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলবে।

অনুবাদ : তালহা বিন নোমান

তথ্যসূত্র

পোলক এ. জে. (১৯৯২), *Collateralized Money: An Idea Whose Time Has Come Again, Challenge, Sept/Aug 1992, Vol.35 Issue 5, p 62.*

ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়নের ওপর অষ্টম আন্তর্জাতিক সম্মেলন, *Financial Performance of Islamic and Conventional Banks in Pakistan: A Comparative Study by Sanaullah Ansari and Atiqa RehmanShaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science & Technology (SZABIST), Islamabad, Pakistan. E: Sanaullah@szabistisb.edu.pk*

Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation.

সিমন, এইচ. ডস. (১৯৪৮), *Economic Policy for a Free Society, Univerity of Chicago Press. Chicago, IL. Pp.165-248.*

সোলে, জে. (২০০৭), *Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems, IMF Working Paper, Monetary and Capital Markets Department. Authorized for distribution by Ghiath Shabshigh July 2007*

ওহালেন, জি. (১৯৯১), *A Proportional Hazards Model of Bank Failure: An Examination of its Usefulness as an Early Warning Tool. Federal Reserve Bank of Cleveland (Research Paper).*

ইসলামী ব্যাংকিং ও সর্বশেষ আর্থিক সঙ্কট

মোহাম্মদ বশির শেঙ্গুয়েল

সারমর্ম

কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক আর্থিক সঙ্কট চলছে। এরই ফলে লেহ্ম্যান ব্রাদার্সের মত বৃহৎ গোষ্ঠীর পতন হয়েছে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সাব-প্রাইম মর্টগেজ সঙ্কট থেকে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি। এই সঙ্কট ক্রমেই তীব্রতর হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)-এর আশঙ্কা এই সঙ্কট বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারকে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এই সঙ্কটের মধ্যেও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলক নিরাপদ ছিল। বলা হচ্ছে, বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট সার্বিকভাবে ইসলামী আর্থিক শিল্পের সামনে একটি বৈশ্বিক মূল ধারার অর্থায়নকারী তথা ঋণ ও ইকুইটিদাতা এবং ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক পছন্দের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।

১. ভূমিকা

আন্তর্জাতিক আর্থিক সঙ্কট-এর কবলে পড়ে লেহ্ম্যান ব্রাদার্স-এর মতো বৃহৎ গোষ্ঠীর পতন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সাব-প্রাইম মর্টগেজ সঙ্কট থেকে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি। এই সঙ্কট গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আইএমএফ।

যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হওয়া এই আর্থিক সঙ্কট গোটা বিশ্বকে গ্রাস করতে চলেছে। এটি বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তিনটি কারণে এই সঙ্কটের শুরু: প্রথমত যুক্তরাষ্ট্রের সাব-প্রাইম আবাসন খাতে অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ দান। দ্বিতীয়ত আবাসন খাতে ঋণগ্রহীতা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান উভয়েই ফটকাবাজির শিকার এবং তৃতীয়ত তারল্য সঙ্কট।

সঙ্কটের কারণগুলো খুঁজে নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার পথ বের করা হয়তো সম্ভব ছিল। কিন্তু এগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী আর্থিক-দুঃস্বপ্নের মতো একটি পরিস্থিতির জন্ম দেয়। আবাসন বাজারে ফটকাবাজি এবং শিথিল নিয়ন্ত্রণবিধির ফলে একটি সমান্তরাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যার আকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং খাতের প্রায় ৪০ শতাংশ (মরগান, ২০০৮)।

এমন পরিস্থিতির জন্য বাড়ির ক্রেতা, বন্ধকী খাত, বিনিয়োগকারী ব্যাংক, নগদ অর্থ জোগানদাতা এবং বীমা পলিসিদাতাসহ সবাই আইনকানুনকেই দায়ী করছে। নীতিনির্ধারকরা আর্থিক বাজারে মূলধন

মোহাম্মদ বশির শেঙ্গুয়েল, অর্থনীতির অধ্যাপক, তিউনিসিয়ার ইউনিভার্সিটি অব তিউনিস মানার-এর ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবরেটরি অব ইকনোমিক ইন্টিগ্রেশন-এ কর্মরত।

জোগান দিয়ে সঙ্কট মোকাবেলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। এর ফলে ঋণবাজারে আস্থা বজায় থাকবে এবং রুগ্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আবার ঋণ দিতে শুরু করবে বলে আশা করছেন তারা।

অন্যদিকে, আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারীরাও বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে আমানতকারী ও স্বল্পমেয়াদি ঋণবাজারের জন্য বীমা সহায়তার পরিসর বৃদ্ধি। বিভিন্ন গবেষণায় পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, এই সঙ্কটের মধ্যেও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলক নিরাপদ ছিল।বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট সামগ্রিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামনে এগিয়ে এসে নিজেদেরকে বৈশ্বিক মূলধারার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। এখানে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন এসে যায়, সাব-প্রাইম মর্টগেজ-এর কারেণ সৃষ্ট সংকটে যখন লেহ্ম্যান ব্রাদার্সের মত বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটে তখন ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এর প্রভাব কম কেন? অনেক নিবন্ধকার ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও গঠন বিশ্লেষণ করে এর উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে– এর কারণ হলো, ইসলামী বিধান। এতে অর্থের বিনিময়ে অর্থ ঋণ দেয়া, সুদ নেয়া, ফটকাবাজি, অতিমাত্রায় ঋণ সৃষ্টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তাছাড়া ইসলামী আইনে ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ (সিডিএস) এবং কোলেটারালাইজড ডেট অবলিগেশন (সিডিও)-এর মতো কোনো বিষাক্ত সিকিউরিটি নিষিদ্ধ। ইসলামী অর্থায়ন ব্যবস্থার এসব বিধিবিধান আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে অনুকরণযোগ্য একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে। আসলে, কল্যাণধর্মী মৌলিক নীতিগুলো অক্ষুণ্ন রেখে নতুন কিছু প্রবর্তন করা মঙ্গলজনক। ইসলাম একটি সহজাত ধর্ম এবং আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই আর্থিক দিগন্তে একটি বিকল্প আর্থিক কাঠামোর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে চিন্তাবিদরা এমন একটি নতুন আর্থিক কাঠামো দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যা বিশ্বের আর্থিক বাজারকে আরো সুস্থির এবং সঙ্কট-সহনীয় করে তুলবে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর ওপর সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কটের প্রভাব খতিয়ে দেখা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এ জন্য প্রথমে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে পর্যালোচনা করা হবে। এরপর দেখা হবে এই খাতের ওপর সঙ্কটের প্রভাব ছিল কেমন। পরিশেষে, সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কট থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলো মুক্ত ছিল এমন প্রকল্প (hypothesis) গ্রহণ বা বর্জনের জন্য একটি ইকনোমেট্রিক (econometric) অনুসন্ধান চালানো হবে।

২. ইসলামী ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা, অনুশীলন এবং মূল বৈশিষ্ট্য

অনৈতিক (মদ, জুয়া, অশ্লীল সামগ্রী, তামাক জাতীয় দ্রব্য, অস্ত্র ও শুকরের মাংস ব্যবসায়) হিসেবে বিবেচিত খাতে লেনদেন নিষিদ্ধ এই নীতি মেনে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ঝুঁকি ও মুনাফা ভাগাগাগি করে নিয়ে বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। ক্যাসিনো, অশ্লীলতা, অস্ত্র ব্যবসা ও শূকরের মাংস সম্পর্কিত ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রত্যাখ্যান করা হয়। সমাজের

জন্য কল্যাণকর এমন প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ উৎসাহিত করে। সুদ দেয়া, শর্ট-সেলিং ও চুক্তি এবং অতি ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনও নিষিদ্ধ। পশ্চিমা অর্থায়নব্যবস্থার সাব-প্রাইম মর্টগেজ, কোলেটারালাইজড ডেট অবলিগেশন বা ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ-এর মতো সমস্যা সৃষ্টিকারী পণ্যগুলো ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ। তাছাড়া মুসলিম চিন্তাবিদরা এমন অনেক পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন যেগুলো ঋণ থেকে শুরু করে বীমা-বন্ড পর্যন্ত অনেক অ-ইসলামী আর্থিক পণ্যের সমান্তরালে কার্যকর।

সুকুক হলো বন্ডের সমতুল্য। কিন্তু এতে ঋণ বিক্রির পরিবর্তে সম্পদের একটি অংশ বিক্রি করা হয়। সুকুক ক্রেতা তার সম্পদ সুকুক ইস্যুকারীর কাছে ভাড়া দেন। ইসলামী অর্থায়ন এমন একটি উত্তম ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড সামনে হাজির করেছে যা অনেক আগে হারিয়ে গিয়েছিল।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গ্রাহকের জন্য অনুকূল নীতিগুলো অনুসরণ এবং প্রকৃত লেনদেন নিশ্চিত করে। এখানে আমরা সম্পদটি দেখতে পারি, সম্পদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় এবং সম্পদটিকে মূল্যায়ন করা যায় : যেমন কোনো সামুদ্রিক জাহাজ বা কোনো উড়োজাহাজ কেনায় অর্থায়ন করা হয় যা চলাচল করবে এবং ব্যবসা দৃশ্যমান হবে। ব্যাংকিং কেমন হবে তার দিকনির্দেশনা দেয় এ ব্যবস্থা। ভন সাইক (২০০১) ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে এমন একটি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা রূপে সংজ্ঞায়িত করেছেন যেখানে আর্থিক মধ্যস্থতার পদ্ধতিগুলো ধর্মীয় বিধি ও অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত। ইসলামের প্রথম শতকে এসব বিধিবিধানের প্রচলন ঘটে। সেখানে সুদভিত্তিক অর্থায়নের পরিবর্তে ঝুঁকির অংশীদারিত্ব নীতি অনুসরণ করা হয়। একইভাবে স্কুন (২০০৩) ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে এমন এক আর্থিক মধ্যস্থতার পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন যেখানে আয় ও মুনাফা কেবল সমভাবে ঝুঁকি গ্রহণে সম্মত হওয়ার ভিত্তিতে অর্জন করা যায়। এখানে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সমাজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ইসলামের স্বর্ণযুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ছিল ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। পশ্চিমা দেশগুলোর উত্থানের পর পুঁজিবাদী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিকাশের ফলে ইসলামী ব্যবস্থা আড়ালে পড়ে যায়।

প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং এই নীতিতে বিশ্বাসী যে, কেবল ঝুঁকি নিয়েই মুনাফা অর্জন করা যায়। আল ওমর ও আবদেল হক (১৯৯৬) এই ব্যাংকিংকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসন তথা ইসলামী শরী'আহ্ আইন কঠোরভাবে অনুসরণের মধ্য দিয়ে পরিচালিত ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।

ইসলামী ব্যাংকিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দ্বারা পরিচালিত। আর তা হলো, যেকোনো ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায্য বিনিময় মূল্য না দিয়ে অন্যায়ভাবে ধনসম্পদ অর্জন অবৈধ এবং ব্যবসার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

"রিবা" বা সুদ এমন একটি আর্থিক সুবিধা যা ঋণদানের শর্ত হিসেবে বা ঋণের মেয়াদ শেষে ঋণদাতাকে অবশ্যই দিয়ে থাকেন ঋণগ্রহীতা। এটি অন্যায় সুবিধা। ইসলামী চিন্তাবিদরা এ বিষয়ে একমত যে, ভোগ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সুদপ্রাপ্তির বিনিময়ে যে তহবিলগুলো সৃষ্টি তা 'রিবা'র ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় মুনাফাপ্রাপ্তি অনিশ্চিত। অন্যদিকে সুদ পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত। তাই কোনো-না-কোনোভাবে এটি আর্থিক শোষণ উৎসাহিত করে। অনিশ্চয়তা বা ফটকাবাজির আশঙ্কা থাকে এমন কোনো ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনও ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ।

এর বদলে, যেকোনো ব্যবসায়িক উদ্যোগের ঝুঁকিতে মূলধন দাতা ও গ্রহীতার অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে মুনাফা অর্জনকে বৈধতা দেয় ইসলামী ব্যবস্থা। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছেঃ বেচাকেনা, লিজিং এবং লাভ-লোকসান ভাগাভাগির চুক্তিতে সরাসরি অর্থায়ন। ইসলামের আইনি কাঠামো ও শর্ত মেনে অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে মুনাফা লাভ করতে বাধা নেই। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শরী'আহ্ নীতি অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। তাই এটি প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে আলাদা।

ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালিত হয় মূলত তিনটি প্রধান শরী'আহ্ বিধান দ্বারা : প্রথম ও সবচেয়ে মৌলিক বিধান হচ্ছে, সুদের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা সাধারণভাবে বাড়তি অর্থ আরোপ ও আদায় রীতিকেই সুদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন (আল-দেহানী, ১৯৯৯)। দ্বিতীয়ত, জুয়া, মদ ও শূকরের মাংস উৎপাদনের মতো ইসলামে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আর্থিকভাবে জড়িত না হওয়া। সর্বশেষ, ধনসম্পদ অর্জনের জন্য অনিশ্চতায় ভরা ও অতি ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে না জড়ানো (আল-ওমর এবং আবদেল হক, ১৯৯৬)। আল-ওমর ও আবদেল হক তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, ইসলামী ব্যাংকগুলো মূলত অর্থ ব্যবহারকারীদের প্রকল্পে সরাসরি বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভ-লোকসানের হিসাব করে। এই ব্যবসায় আমানতকারীদের গণ্য করা হয় ব্যাংকের অংশীদার রূপে। এখানে কোনো বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে ন্যূনতম লাভের নিশ্চয়তা অথবা তাদের গচ্ছিত অর্থ বা আমানতের জন্য কোনো পূর্বনির্ধারিত হারে লাভ দেয়া হয় না।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর সব কার্যক্রমে অর্থনৈতিক বিষয়টি নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করা হয় এবং সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখা হয়। এখানে ব্যাংকের কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের জন্য মুনাফা অর্জনই একমাত্র বিবেচ্য নয়। পশ্চিমা ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এই ধারণা সম্পূর্ণ অচেনা। তাই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে আলাদাভাবে একটি পরিপূর্ণ আর্থিক পদ্ধতি ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। কারণ এই ব্যবস্থায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক অন্য রকম।

একইভাবে লিউইস ও আলগোর্ড যুক্তি দেখান যে, উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহারের জন্য আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক এবং উদ্বৃত্ত অর্থের ইউনিট (আমানতকারী) ও ঘাটতিতে থ াকা (বিনিয়োগকারী)'র মধ্যে একটি অংশীদারিত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। ফলে, এই পদ্ধতি ঋণ খাতে অর্থায়নের পরিবর্তে একটি সুসম অর্থায়নের দিকে অগ্রসর হয়।

৩. ইসলামী ব্যাংকিং খাতের অবস্থা

বিশ্বে ইসলামী আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। আল কুরচি (২০০৫) বিগত তিন দশকে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির বিকাশ পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ১৯৭৫

সালে এক দেশের একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান থেকে আজ বিশ্বের ৭৫টি দেশে তিন শ'র বেশি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এর মধ্য দিয়ে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পৃথিবীজুড়ে একটি অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। যেমন, বর্তমানে সুদান ও ইরানের সামগ্রিক ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী আর্থিক রীতি মেনে পরিচালিত হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী ব্যাংক বেশি দেখা গেলেও ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রেও এর উপস্থিতি ক্রমেই চোখে পড়ছে।

৪. আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং-এর উৎপত্তি

প্রাক-ইসলামী যুগেও মুনাফা ভাগ করে নেয়া ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তবে ইসলাম আবির্ভাবের পর এই রীতিনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। লিউইস ও আলগোর্ড (২০০১) ইতিহাসের নিরিখে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, এই পদ্ধতি মূলত একটি সরল নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আর তা হচ্ছে কোনো জটিলতায় না গিয়ে সরাসরি মুনাফা ভাগাভাগি করে নেয়ার নীতি।

ঔপনিবেশিক আমলে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা আধিপত্য বিস্তার করার পর মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির গুরুত্ব অনুভূত হতে থাকে। মুসলিম বিশ্বে ইসলামী চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬০ ও ১৯৭০'র দশকে ইসলামী ব্যাংকিং-এরও নবোত্থান ঘটতে শুরু করে। এই নবোত্থানের প্রকৃতি পরীক্ষামূলক হলেও, এরই মধ্যে ৭০টি দেশে ইসলামী ব্যাংকিং সম্প্রসারিত হয়েছে। এসব দেশের বেশিরভাগ মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায়। আজ বেশিরভাগ মুসলিম দেশেই কোনো-না-কোনোভাবে ইসলামী ব্যাংকিং নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। যদিও বাস্তবায়নের মাত্রা সব দেশে এক নয়।

লিউইস ও আলগোর্ড দেখিয়েছেন, আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিস্তৃতি ঘটছে মূলত দুটি ধারায়। প্রথ মত, কোনো দেশের প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তর। পাকিস্তান, ইরান ও সুদান এভাবে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। বাকি বেশিরভাগ দেশ অবলম্বন করেছে দ্বিতীয় পন্থা। এতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও গ্রাহক উভয়ে নিজ নিজ উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলে একই সঙ্গে প্রচলিত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির একটি মিশ্র ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে।

আল-ওমর ও আবদেল হক (১৯৯৬) আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি চর্চার বিষয়টি ইতিহাসের নিরিখে পর্যালোচনা করেছেন। ১৯৬৩ সালে মিসরে পরীক্ষামূলক এই পদ্ধতি চালু করা হয়। মাত্র ৪ বছর চলার পর ১৯৬৭ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। এরই মধ্যে মোট ৯টি ব্যাংক এ কার্যক্রম চালায়। ব্যাংকগুলো ২ লাখ ৫০ হাজার আমানতকারীর কাছ থেকে ১.৮ মিলিয়ন মিসরীয় পাউন্ড আমানত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। অবশ্য কিছু রাজনৈতিক কারণে এই পদ্ধতি টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। ব্যাংকগুলোও প্রয়োজনীয়সংখ্যক ক্ষুদ্র আমানতকারীকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

এরপর হাসান ও বশীর (২০০৩) ১৯৮০ ও ১৯৯০'র দশকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যালোচনা করেছেন। তাঁরা এই খাতের ব্যাপক সম্প্রসারণ লক্ষ করেন। বর্তমানে ৭০টি দেশে ইসলামী ব্যাংকিং

চালু রয়েছে। অনেক মুসলিম দেশে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের অভ্যন্তরীণ বাজারে ইসলামী ব্যাংকগুলো দ্রুত অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। একইভাবে স্কুন (২০০৩) ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিকাশ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী এই খাতের ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উপসাগরীয় অঞ্চলে এই প্রবৃদ্ধির হার ১৫ শতাংশ। যা প্রচলিত ব্যাংকিং-এর তুলনায় অনেক বেশি। তাই জহির ও হাসান (২০০১) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ২০০৯-২০১০ সালের মধ্যে মোট ইসলামী সঞ্চয়ের ৪০-৫০% শতাংশ দখল করে নেবে ইসলামী ব্যাংকিং।

উসেম (২০০২) বলেন, সিটি গ্রুপ ও এইচএসবিসি'র মতো প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোও উপসাগরীয় অঞ্চলে 'ইসলামিক উইনডো' খুলেছে। ভন সাইক (২০০১) বলেন, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যার দেশগুলোর ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এই পালাবদল ঘটেছে। তিনি লক্ষ করেন, ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী সাধারণ মানুষ উল্লেখযোগ্য হারে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে ইসলামী ব্যাংকিং বেছে নিচ্ছেন। ইসলামী ব্যাংকগুলো উদ্বৃত্ত তহবিল সংগ্রহ করে জনগণের সার্বিক কল্যাণে বিনিয়োগ করছে। সেখানে শর্ত থাকে যে মুনাফা হলে তা ভাগাভাগি হবে, লোকসান হলে তাও ভাগাভাগি করতে হবে। মূলত বিনিয়োগকারী ও আমানতকারী উভয় পক্ষই মুনাফা-লোকসান ভাগ করে নিবে।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার বিষয়টি অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থার অগ্রগতি প্রচলিত ব্যাংকিংকে ছাড়িয়ে গেছে। ব্যাংকিং-এর দুটি ধারা এবং এগুলোর সংমিশ্রণ উভয় পদ্ধতির মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র করেছে। এই প্রতিযোগিতা প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মধ্যে অপ্রতুল আর্থিক সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে।

৫. ইসলামী ব্যাংকিং ও সাম্প্রতিক সঙ্কট

ইসলামী ব্যাংকগুলো বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা থেকে মুক্ত ছিল। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তা এ ব্যাপারে নিশ্চিত। গঠন প্রকৃতির কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ওপর বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এমনকি পদ্ধতিকাঠামো ও পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো চলমান সঙ্কট থেকে মুক্ত থাকবে বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, এগুলো ঋণ নিয়ে বাণিজ্য করে না এবং ইউরোপ ও আমেরিকার মতো ফটকা বাজারের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

বিগত আর্থিক সঙ্কট থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলো মোটামুটিভাবে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে। কারণ, এগুলো প্রচলিত ব্যাংকের মতো আন্তঃব্যাংক বাজার থেকে ধার করে না। পরিবর্তে তাদের আমানত থেকেই গঠিত হয় তহবিল। তাছাড়া এগুলোর কোনো রকম বিষাক্ত 'কোলেটারালাইজড ডেট অবলিগেশন' নেই। সুদ লেনদেন হয় এমন কোনো 'সিকিউরিটি' গ্রহণ ইসলামী ব্যাংকিং-এ নিষিদ্ধ। ইসলামী অর্থায়ন শিল্প খুচরা ও বিনিয়াগ ব্যাংকিং, বীমা, তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং শরী'আহ্সম্মত 'সিকিউরিটি' লেনদেন করে থাকে।

শরী'আহ্ বা ইসলামী আইনে ঋণের ওপর সুদ (রিবা বা উসারি) লেনদেন নিষিদ্ধ। তা ছাড়া ইসলামী নীতি পরিপন্থী যেমন : শূকরের মাংস, মদ বা জুয়ার সঙ্গে যুক্ত এমন কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ঋণ নিয়ে বাণিজ্য ও মুদ্রা পাচারের বিষয়ে সতর্ক থাকা। তাছাড়া, আর্থিক সমস্যা ও ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ না করার মতো ব্যাংকব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত বিধিনিষেধগুলো মেনে চলা। এর পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংক কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাব করে, যেমন– "ইজারাহ বাই তামলিক" (ভাড়ার চুক্তি যা মালিকানায় সমাপ্তি ঘটে) "মুরাবাহা" ইত্যাদি। ইসলামী ব্যাংকিং যে অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় হওয়ার মতো একটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল বিকল্প ব্যবস্থা, এর মধ্য দিয়ে তা বোঝা যায়। তাই ক্রমেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থার প্রসার ঘটবে এবং সেই সঙ্গে গ্রাহকসংখ্যাও অনেক বাড়বে বলে আশা করা যায়।

ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প থেকে দূরে থাকার দৃঢ়সঙ্কল্পই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। আর্থিক সঙ্কটের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি বড় ধরনের মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। কারণ, প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় ঋণ কেনা এবং প্রকৃত লেনদেন ছাড়াই গ্রাহকসংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো এ ধরনের কোনো ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে অংশ নেয় না। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলোর ওপর আন্তর্জাতিক সঙ্কটের কোনো প্রভাব পড়লেও তা হচ্ছে মুনাফার ওপর, মূলধনের ওপর নয়। কারণ, প্রচলিত ব্যাংকিং-এর চেয়ে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মূলধন অনেক বেশি সুরক্ষিত।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিরই একটি অংশ। তাই বৈশ্বিক সঙ্কটের ওপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু, ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকে বিনিয়োগ করে না। তাই এগুলো উপরোক্ত ধরনের সঙ্কটে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। লক্ষণীয় বিষয় হলো, উপসাগরীয় ও আশপাশের এলাকায় যে সঙ্কট তা মূলত মনস্তাত্ত্বিক এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রচারণার ফসল। অ্যালেন ও আনউইন (২০০৮) ইসলামী ব্যাংকিং-এর নীতিমালা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, এই ব্যাংক শরী'আহ্ আইনের ভিত্তিতে গঠিত এবং মালয়েশিয়ায় এর সবচেয়ে ভালো বিস্তার ঘটেছে। যেকোনো ধরনের সুদ ও ফটকাবাজি পরিহার করে এই ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এখানে ক্যাসিনোর মতো 'অনৈতিক' ব্যবসায় বিনিয়োগও নিষিদ্ধ।

এই ব্যাংক গ্রাহকদের পক্ষে সম্পদ কিনে নেয়। গ্রাহক সম্পদটি ব্যবহারের বিনিময়ে নির্দিষ্ট ফি'সহ ধার পরিশোধ করে। ধার পরিশোধ হয়ে গেলে সম্পদের মালিকানা লাভ করে ঐ গ্রাহক। এ ব্যবস্থার সুবিধা হচ্ছে, ব্যাংক শুধু লাভের নয় ঝুঁকিরও অংশীদার। তাই এ ব্যবস্থা সম্ভাবনাময় গ্রাহকদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। এই অংশীদারিত্ব (ঝুঁকি ও মুনাফা ভাগাভাগি) এবং অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ইসলামী ব্যাংকিং-এর বৈশিষ্ট্য।

লরেট্টা ন্যাপোলিয়নি (২০০৪) ১৯৯০-এর দশকে এশিয়ার আর্থিক সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করেছেন। তখন আইএমএফ-এর কঠিন শর্ত মেনে আর্থিক সহায়তা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কয়েকটি দেশ (থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন)। ফলে সঙ্কট আরো তীব্র হয়। এ পরিস্থিতির জন্য

আন্তর্জাতিক ফটকাবাজদের দায়ী করে মালয়েশিয়া। দেশটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং এর পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। ফলে এটিই একমাত্র দেশ যা তেমন কোনো ক্ষতি স্বীকার না করেই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল।

ক্লানচি ইয়েটস (২০০৪) এ অবস্থার পুনরাবৃত্তি দেখেছেন সবখানে। তিনি বলেন, "পশ্চিমা দেশগুলো যখন বিধ্বংসী অবস্থার শিকার, তখন অতিসম্প্রতি সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে 'ডাউ জোনস ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইনডেক্স' ৪.৭৫ শতাংশ বেড়েছে। বিগত বছরগুলোতে এ সূচক ৭ শতাংশের মতো মাঝারি গোছের মূল্য হারায়।" তাই ইতঃপূর্বে আলোচনার নিরিখে বিশ্বে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের পুঞ্জীভূত ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংকিং থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কী হতে পারে তা ভেবে দেখা উচিত। বর্তমান সঙ্কটের জন্য দায়ী আমেরিকায় অনিয়ন্ত্রিত ফটকাবাজি (যা মূলত পুঞ্জীভূত ঋণের সঙ্গে সম্পর্কিত)।

ফটকাবাজি (Credit Default Swaps – CDS) সম্পর্কে মার্কিন সাময়িকী ফরচুন-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঋণ খেলাপির আতঙ্ক এক দশক ধরে প্রতি বছরই দ্বিগুণ হচ্ছে। এ ব্যবসা পুরোপুরি অস্বচ্ছ। ফটকাবাজি ব্যবসার আকারও অনুমাননির্ভর। ধারণা করা হয়, এর পরিমাণ ৫৪.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (অন্যদিকে, বৈশ্বিক জিএনপি ৫৪.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার)। বিক্রেতারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াতে পারে!

৬. ইসলামী ব্যাংকিং-এর সমালোচনা

আরিফ (২০০২)-এর মতে, ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্রমাগত উন্নতি করে গেলেও অন্যান্য আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের মতো এরও সমালোচনা করার মতো অনেক নেতিবাচক দিক রয়েছে। একটি মজার বিষয় হলো, প্রচলিত আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর প্রাধান্য এখনো বহাল। ওমর ও আবদেল হক (১৯৯৬)-এর মতে, ইসলামী ব্যাংকের এখনো শৈশবকাল কাটেনি। স্থানীয় ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর মতো ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। এতে দক্ষ পেশাদার ব্যক্তির ঘাটতি রয়েছে; তেমন পণ্যবৈচিত্র্য ও মানসম্মত সেবা নেই; মূল্যসাশ্রয়ী নয়; মাধ্যমিক বাজারেরও তেমন উন্নয়ন ঘটেনি। তাছাড়া, অতি ঝুঁকিপূর্ণ ইকুইটি অর্থায়ন, নৈতিকতার বিড়ম্বনা, ত্রুটিপূর্ণ বাছাই, রাজনৈতিক চাপ, ঝুঁকি থেকে বাঁচার স্বল্প উপায় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্ভাব্য সঙ্ঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা।

আরেসি (২০০৩) দেখান, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রায়ই কাঁচা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অন্যদিকে, আগরওয়াল ও ইউসুফ (২০০০) মনে করেন যে, পুরোপুরি ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে মুসলিম সরকারগুলোর মধ্যে সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও পাওয়া যায় না। এসব কারণ নিঃসন্দেহে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলবে। তাছাড়া, ইসলামী

ব্যাংকিংকে একটি নৈতিক ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যাংক রূপে বিবেচনা করা হয়। এখানে মুনাফা অর্জনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় নৈতিকতা।

প্রচলিত আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক-এর প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি মূলত মুনাফা অর্জন। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি স্ববিরোধী এবং নীতিবিচ্যুত মনে হতে পারে। তবে এটা সুবিবেচনাপ্রসূত। যদিও একথা সত্য যে, অনেক পুরোদস্তুর ইসলামী ব্যাংক আর্থ-সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট হয়েছে। এসব ব্যাংককে এক সময় ওইসব প্রচলিত ব্যাংকের কাছে বাজার-অংশ হারাতে হয়েছে, যেগুলো কেবল মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।

এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর চেয়ে অনেক বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কারণ, প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলো মুনাফা লাভের সম্ভাবনা দেখলে ইসলামী ব্যাংকিং নীতি গ্রহণে কুণ্ঠিত হয় না (আল ওমর ও আবদেল হক, ১৯৯৬)। তা ছাড়া আরিফ (২০০২)-এর মতে, প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সব আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট ইসলামী ব্যাংকগুলোর পক্ষে অনুসরণ করাও সম্ভব হয় না।

৭. উপসংহার

বিশ্বায়নের যুগে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি বাইরে থেকে আসা প্রতিযোগিতা এবং অধিগ্রহণ। কারণ, ইসলামী ব্যাংকগুলো আকারে ছোট এবং ন্যূনতম যে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত বলে মনে করা হয়, এগুলোর তাও নেই। তাই বলা যায়, বৈশ্বিক সঙ্কটের বিস্তৃতি ঘটলে দৃঢ় অবস্থানে থাকার পরও ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে। বিশেষ করে, মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রাইভেট ইকুইটি ও আবাসন খাতে বিনিয়োগের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। তা ছাড়া সম্পত্তির বিপরীতে প্রচুর ঋণ দিয়েছে এগুলো। তাই, আবাসন খাতের বাজার পড়ে গেলে এর নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী।

কোনো ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করবে। এই সম্পত্তি বাজারে বিক্রি করা যাবে, কিন্তু কত দামে? প্রতিটি ব্যাংকই এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোকে ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার নীতিমালা থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো গ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে। পরামর্শ দেয়া হচ্ছে মদ, জুয়া ও অশ্লীলতাপূর্ণ ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিবর্তে নৈতিক ব্যবসায় বিনিয়োগের।

অনুবাদ : মাহবুব-উল আলম

তথ্যসূত্র

আবদেল করিম, আর. এ (২০০৪), *Accounting Standards for Islamic Financial Services: A Standard-setter's Perspective,* মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪-এ অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় অ্যাকাউন্টিং সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধ ।

আগারওয়াল, আর.কে. এবং ইউসেফ, টি. (২০০০), *Islamic banks and investment financing,* জার্নাল অব মানি, ক্রেডিট অ্যান্ড ব্যাংকিং, খণ্ড ২১, নং ১, পৃঃ ৯৩-১২০ ।

আখাভেইন, জে.ডি., বার্জার, এ.এন. এবং হামফ্রে, ডি.বি (১৯৯৭), *The Effects of Megamergers on Efficiency and Prices: Evidence from a Bank Profit Function,* রিভিউ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন, খণ্ড ১২, পৃঃ ৯৫-১৩৯ ।

আলম, ইলা এম.এস. (২০০১), *A Nonparametric Approach for Assessing Productivity Dynamics of Large US Banks,* জার্নাল অব মানি, ক্রেডিট অ্যান্ড ব্যাংকিং, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ১২১ ।

আল-দিহানি, টি. আবদেল করিম, আর.এ. এবং মুরিন্ডে, ভি. (১৯৯৯), *The Capital Structure of Islamic Banks Under The Contractual Obligation of Profit Sharing,* ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স, খণ্ড ২, নং ৩, পৃঃ ২৪৩-২৮৩ ।

এলেন এল. এবং রাই, এ. (১৯৯৬), *Operational Efficiency in Banking: An International Comparison,* জার্নাল অব ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স, খণ্ড ২০, পৃঃ ৭৯-১১১ ।

এম. ওমর, এফ. এবং আবদেল-হক (১৯৯৬), *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি ।

এল, এইচ. ওয়াই., গ্রাবস্কি, আর., পাসুরকা, সি. এবং রঙ্গন, এন. (১৯৯০), *Technical, Scale and Allocative Efficiencies in US Banking: An Empirical Investigation,* দি রিভিউ অব ইকনোমিকস অ্যান্ড স্যাটিস্টিকস, খণ্ড ৭২, পৃঃ ২১১-২১৮ ।

আরায়সি, এম. (২০০৩), *Islamic financial institutions: Where are they going?,* ইতালির প্রাটোতে ৯-১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং কনফারেন্স-এ পঠিত প্রবন্ধ ।

আর্চার, এস., করিম, আর.এ. (২০০২), *Islamic Finance, Innovation and Growth, Publ. Euromey Institutional Investor,* ২০০২, যুক্তরাজ্য ।

আরিফ, এম. (২০০২), *Saturday Forum: Islamic Banking and Globalisation,* খবরঃ স্ট্রেইট টাইমস, ৩১ আগস্ট ২০০২ ।

আভকিরন, এন.কে. (১৯৯৯এ), *Decomposing the Technical Efficiency of Trading Banks in the Deregulated Period,* অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে, ১৬-১৭ ডিসেম্বর বার্ষিক ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং কনফারেন্স-এ পঠিত প্রবন্ধ ।

আভকিরন, এন.কে. (১৯৯৯বি), *The Evidence on Efficiency Gains: The Role of Mergers and the Benefits to the Public,* জার্নাল অব ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৯৯১-১০১৩ ।

চাপরা, ইউ. (২০০৩), *Islamic Banking: An Alternative Model for Financial Intermediation,* ইতালির প্রাটোতে ৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩, অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক ব্যাংকিং কনফারেন্স-এ পঠিত প্রবন্ধ ।

হারুন, এস. এবং আহমেদ, এন. (২০০০), *The effects of conventional interest rates and rate of profit on funds deposited with Islamic banking system in Malaysia,* ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইসলামিক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, খণ্ড ১, সংখ্যা ৪ ।

হাসান, এম.কে. এবং বশির, এএম (২০০৩), *Determinants of Islamic Banking Profitability,* ইআরএফ পেপার ।

হাসুনে, এ. (২০০২), *Islamic Banks' Profitability in an Interest Rate Cycle,* দি আরব ব্যাংক রিভিউ, খণ্ড ৪, নং ২, পৃঃ ৫৪-৫৮ ।

সুন্দররাজন, ভি. এবং এরিকো, (২০০২), *Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial System: Key Issues in Risk Management and Challenges Ahead,* আইএমএফ ওয়ার্কিং পেপার ১৯২, ওয়াশিংটনঃ ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড ।

সুলক, বি.জে. (১৯৬৪), *Indices for Multiregional Comparisons,* স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ, খণ্ড ৩, পৃঃ ২৩৯-২৫৪ ।

দি ইকনোমিস্ট (২০০৩), *Islamic Finance West Meets East,* ২৩ অক্টোবর ২০০৩ ।

ভন, সাইক, ডি. (২০০১), *Islamic Banking,* দি আরব ব্যাংক রিভিউ, খণ্ড ৩, নং ২, পৃঃ ৪৫-৫১ ।

ইয়াকোপ, এন.এম. (২০০৩), *Developing an Islamic Banking System: The Malaysian Model,* ইতালির প্রাটোতে ৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩, অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক ব্যাংকিং কনফারেন্স-এ পঠিত প্রবন্ধ ।

ইয়াশাহ, এস., হুই, সি. ডব্লিউ এবং গোহ, ডব্লিউ.কে. (২০০১), *Rating of Commercial Banks: A DEA Approach,* ব্যাংকার্স জার্নাল মালয়েশিয়া, খণ্ড ১১৮, পৃঃ ৫-১৮ ।

জাহের, টি.এস. এবং হাসান, এম.কে. (২০০১), *A comparative literature survey of Islamic finance and banking,* ফিনান্সিয়াল মার্কেটস, ইন্সটিটিউশনস অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টস, খণ্ড ১০, নং ৪, পৃঃ ১৫৫-১৯৯ ।

আর্থিক সঙ্কট : পশ্চিমা বনাম ইসলামী ব্যাংকিং

মাইকেল বাসলার

সারমর্ম

সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কট যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের আর্থায়ন বাজারে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বিশেষ করে 'মর্টগেজ ব্যাকডভিত্তিক সিকিউরিটি'তে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন সবচেয়ে বেশি। সঙ্কটের কারণে সম্পদের মূল্য ঋণের অংকের চেয়ে নিচে নেমে যায়। বিপুল ক্ষতি বহন করতে হয় বিনিয়োগকারীদের। যেসব দেশ ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন (আইবিএফ) পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা ছিল এ ক্ষতির বাইরে। মূলত বিশেষ ধরনের বন্ড ছিল এর কারণ। এই গবেষণায় পশ্চিমা বিশ্বের সমস্যা খতিয়ে দেখা হয়েছে। পরে তা তুলনা করা হয়েছে 'দুবাই ওয়ার্ল্ড'-এর একই ধরনের সমস্যার সঙ্গে। বিনিয়োগকারীদের মুনাফা পরিশোধ করতে গিয়ে সেখানেও 'স্থবিরতা'র ঘটনা ঘটে। তবে ইসলামী ব্যাংকিং আইনের কারণে 'দুবাই ওয়ার্ল্ড সুকুক' ক্রেতারা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে মনে হয় না। এর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব খতিয়ে দেখা হয়েছে এই নিবন্ধে।

সূচনা

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি সর্বদা নিজস্ব মালিকানাকে উৎসাহিত করে। সেই ১৯৩২ সালে প্রেসিডেন্ট হাবার্ট হুভার এক ভাষণে বলেছিলেন, "আমাদের সবসময় এমন মানুষ প্রয়োজন যাতে নিজস্ব মালিকানা উৎসাহিত হয়।" তখন থেকেই সরকারি নীতিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হচ্ছে। সরকারি নীতি হলো, অধিকসংখ্যক নাগরিক যেন অন্যের বাড়িতে ভাড়া থাকার পরিবর্তে নিজ বাড়ির মালিক হয়। তাই বাড়ি মালিক হওয়ার জন্য সেখানে সরকারি হোম মর্টগেজ ও বিশেষ কর রেয়াত কর্মসূচি রয়েছে। ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাড়ির মালিক এমন নাগরিক সংখ্যা ৬২% থেকে ৭০%-এ উন্নীত করতে এক নিবিড় কর্মসূচি গ্রহণ করে। এরই ফল ক্লিনটন প্রশাসনের 'ন্যাশনাল হোমওনারশিপ স্ট্র্যাটেজি'। ওই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল "বাড়ি কেনার মতো অর্থের অভাব রয়েছে অথবা ডাউনপেমেন্ট দেয়ার মতো আয় নেই এমন নাগরিকদের সহায়তার জন্য সৃজনশীল অর্থায়ন কর্মকৌশল গ্রহণ।"

এই সরকারি নীতি বাড়ির চাহিদা বাড়িয়ে দিয়ে বাজার পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। মর্টগেজ পাওয়ার জন্য ইতঃপূর্বে যে 'ক্রেডিট স্ট্যান্ডার্ড' ছিল নতুন নীতিতে তা শিথিল করা হয়। এটা ব্যাংক ও মর্টগেজ

ড. মাইকেল বাসলার : রিচার্ড স্টকটন কলেজের পাবলিক পলিসি সেন্টারের ফেলো এবং অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি 'ফিন্যান্স অ্যান্ড গেমস থিওরি' এবং 'ম্যানেজারিয়াল ইকনোমিকস অ্যান্ড কর্পোরেট ফিন্যান্স'-এ বিশেষজ্ঞ। ফোর্ড মোটর কোম্পানি ও এফএমসি করপোরেশন-এ ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট হিসেবেও কাজ করেন তিনি। অনেক দেশের গবেষণাপত্রে তার নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি তিনি রিয়েল অ্যাস্টেট ডেভেলপমেন্ট খাতের একজন উদ্যোক্তা।

কোম্পানিগুলোর জন্য অধিক ঝুঁকির আশঙ্কা সৃষ্টি করলেও ফেনি মায়ি ও ফ্রেডি ম্যাক-এর মতো আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরনের সাব-প্রাইম মর্টগেজ মূল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কিনে নিতে এগিয়ে আসে। এতে অন্তর্নিহিত ঝুঁকি প্রথম মর্টগেজ সৃষ্টিকারীর কাছ থেকে আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে স্থানান্তরিত হয়। পরিশেষে এরা মর্টগেজগুলো প্যাকেজে পরিণত করে তা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বিক্রি করে দেয় (মাকিন, ২০০৯)।

২০০০ সালের পর এই প্রচেষ্টা তিনটি ক্ষেত্রে তীব্র হয়ে ওঠে। প্রথমত, ফেডারেল রিজার্ভ-এর 'ইন্টারেস্ট রেট পলিসি' নিম্নমুখী হয় এবং 'ধারের মূল্য' (cost of borrowing) ইতিহাসের সর্বনিম্নপর্যায়ে নেমে আসে। দ্বিতীয়ত, বাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই এমন মানুষও যেন বাড়ির মালিক হতে পারেন সে জন্য সরকার বিশেষ ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এবং তৃতীয়ত বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের নিরাপত্তা ঝুঁকি ও মূল্যের যে হিসাব করেছিল তা হয় অতিমাত্রায় উদার এবং এগুলোর জামানত ছিল মর্টগেজ।

১৯৯৭ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গতানুগতিক আবাসনের মূল্য ১২০%-এরও বেশি বেড়ে যায় (দি ইকনোমিস্ট, ২০০৮)। আবাসনের এই চড়ামূল্যের সময় অনেক বাড়িমালিক বাড়ি কেনার পেছনে নতুন করে অর্থবিনিয়োগ করে। এটা করা হয় দ্বিতীয় মর্টগেজ গ্রহণের মাধ্যমে। সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদি লোন প্যাকেজিং, মার্কেটিং ইনসেনটিভ-এর কারণে আবাসন মূল্য বেড়ে যায়। তখন ঋণগ্রহণকারীদের মনে এমন ধারণা জন্মে যে তারা নিকট ভবিষ্যতে আরো অনুকূল শর্তে পুনঃঅর্থায়ন করতে সক্ষম হবে। এতে তারা কঠিন সব মর্টগেজ গ্রহণে উৎসাহিত হয়। অর্থায়ন বাজারে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকাররা 'অ্যাসেট অ্যান্ড মর্টগেজ ব্যাকড সিকিউরিটিজ' (এবিএস এবং এমবিএস) এবং কোলেটারালাইজড ডেট অবলিগেশনস (সিডিও) সৃষ্টি করে। যা অটোলোন-এর পরিবর্তনশীল হার, ক্রেডিট কার্ড, মর্টগেজ পেমেন্ট এবং আবাসনের মূল্য থেকে তাদের মুনাফা আদায় করে নেয়। ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো এসব সিকিউরিটিকে 'নিরাপদ রেটিং' হিসেবে ঘোষণা করে।

ফলে অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সাব-প্রাইম ঋণ প্রদানের জন্য বিনিয়োগ তহবিল লাভে সক্ষম হয়। এতে 'হাউজিং বাবল' আরো স্ফীত হয় এবং সেই সাথে অত্যন্ত উঁচু মাত্রায় 'ফি' সৃষ্টি করে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত সৃষ্ট সব মর্টগেজ-এর ক্ষেত্রে 'অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজ' ১০%-এর নিচে থাকে। এরপর তা বেড়ে ২০%-এর কাছাকাছি পৌঁছে এবং ২০০৬ সাল জুড়ে এ অবস্থা চলতে থাকে (বারনানকি, ২০০৭)।

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মর্টগেজ রেট-এর ঊর্ধ্বমুখী সমন্বয়ের কারণে খেলাপি বেড়ে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে আবাসনমূল্য ২০০৬ সালের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে ২০%-এর বেশি পড়ে যায় (স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস, ২০০৮)। এরপর সাব-প্রাইম এবং অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজ-এ খেলাপি হার দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে। বড় বড় যেসব অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ঋণ নিয়ে সাব-প্রাইম এমবিএস-এ ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করেছিল আবাসন মূল্য কমে যাওয়ায় সেগুলো গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আবাসনের দাম মর্টগেজ লোন-এর চেয়েও নিচে নেমে যায়। এতে বাড়ির মালিকদের জন্য অধিগ্রহণের সুযোগ (বন্ধকি চুক্তি অনুযায়ী সম্পত্তি দখলের অধিকার প্রয়োগ) নেয়াই আর্থিকভাবে লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়।

দাম অব্যাহতভাবে কমতে থাকলে 'অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজ'-এর আওতাভুক্ত ঋণগ্রহীতারা সুদের ক্রমবর্ধমান হারের সঙ্গে যুক্ত উচ্চতর পরিশোধ এড়াতে আর পুনঃঅর্থায়ন করতে পারলেন না।

এতে খেলাপি আরো বেড়ে যায়। ২০০৮ সালে ঋণদাতারা প্রায় ২৩ লাখ সম্পত্তির বিরুদ্ধে অধিগ্রহণ মামলা করে, যা ছিল ২০০৭ সাল থেকে ৮১% বেশি। ২০০৮ সালের আগস্টের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সব মর্টগেজ-এর ৯.২% হয় ত্রুটিপূর্ণ ঘোষণা, না হয় অধিগ্রহণ করা হয়। এক বছরের মাথায় এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪.৪% (স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস, ২০০৮)।

যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন খাতের এই ধস বৈশ্বিক আবাসন খাতের 'বাবল'টি ফাটিয়ে দেয়। এতে রিয়েল অ্যাস্টেট খাতের দামের সঙ্গে যুক্ত সিকিউরিটিগুলোর দামও পড়ে যায়। সারা বিশ্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাংক সলভেন্সি, ঋণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কমে যাওয়া, তারল্য সঙ্কট এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বিনষ্ট হওয়া - এ সবগুলো বিষয় বিশ্বের শেয়ারবাজারে প্রভাব ফেলে। ফলে ২০০৮ সালের শেষ ও ২০০৯ সালের শুরুর দিকে শেয়ারের ব্যাপক দরপতন ঘটে। ঋণ পাওয়া কঠিন হয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমে যাওয়ায় এ সময়টিতে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধীর হয়ে পড়ে (ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক আউটলুক, ২০০৯)।

তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং দুবাই ওয়ার্ল্ড

উপরোক্ত আর্থিক সঙ্কটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তেলের মূল্য বেড়ে যাওয়া। এটি ছিল দুবাই ওয়ার্ল্ড এবং এর স্থবিরতা (standstill)-র সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে আবাসন খাতের 'বাবল' ফেটে যায়। ২০০৭ সালে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের দাম যেখানে ছিল ৫০ মার্কিন ডলার, ২০০৮ সালের জুলাইয়ে তা তিন গুণ বেড়ে ১৪৭ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০০৮ সালের শেষ দিকে আর্থিক সঙ্কট শুরু হলে ওই বছরের ডিসেম্বরে তেলের দাম প্রায় ৭৫% কমে গিয়ে ৩৭ ডলারে নেমে আসে (ফিউচার ট্রেডিং চার্টস, ২০০৮)। পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো, বিশেষ করে দুবাইয়ের জীবনীশক্তি হলো এই তেল বিক্রির অর্থ। দুবাইয়ে সম্পত্তিমূল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হলো তেলের উচ্চমূল্য। যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন খাতে ধস এবং তেলের মূল্য কমে যাওয়ায় দুবাই-এর অবস্থাও একই দাঁড়ায়। আবাসন খাতে মূল্যধসের কারণে দুবাই ওয়ার্ল্ডের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান নাখিল-এর মতো বৃহৎ ডেভেলপাররা উন্নয়ন কাজ বন্ধ করে দেয় এবং জনবল ছাঁটাই শুরু করে।

২০০৯ সালে তেলের মূল্যে ব্যাপক পতন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন আঘাত। পুঁজি প্রবাহ উল্টোমুখো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে অর্থায়ন কমে গেলে ওই অঞ্চলের জন্য গুরুতর সঙ্কট তৈরি হয়। স্থানীয় রিয়েল এস্টেট এবং ইকুইটি মার্কেট তীব্র চাপে পড়ে। অভ্যন্তরীণ তারল্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং কিছু প্রতিষ্ঠানের ঋণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় (ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক আউটলুক, ২০০৯)। অনেক দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় টানাপোড়ন সৃষ্টি এবং বৈশ্বিক বাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বহু 'সভরেইন ফান্ড' গুরুতর ক্ষতির শিকার হয়। অধিকন্তু, রফতানি প্রবৃদ্ধি এবং পর্যটন খাতে রাজস্ব আয়েও ধস নামে।

বিশেষ করে মুদ্রা অবমূল্যায়নের আশঙ্কায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রবেশ করা বৈদেশিক তহবিল বেরিয়ে গেলে তারল্যের ভয়াবহ সঙ্কট সৃষ্টি হয়। এতে জমি ও ইকুইটি মূল্যে বড় ধরনের পতন ঘটে এবং ব্যাংকব্যবস্থার ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি হয় (ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক আউটলুক, ২০০৯)।

আরো বিশেষভাবে বলতে গেলে ২০০৮ সালের হেমন্তে 'প্রপার্টি বাবল' বিস্ফোরণের পর থেকে দুবাই বিপুলায়তন ঋণের বোঝার সঙ্গে সংগ্রাম করছে। এর আগে ইউএই-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ব্যাপকভাবে অর্থ ধার করত। এর শীর্ষে ছিল দুবাই ইনকরপোরেট এনটিটিগুলো। ২০০৬-২০০৮ সালের মধ্যে এক্সটার্নাল পাবলিক সিন্ডিকেটেড লোন এবং বন্ড মার্কেট থেকে দুবাই মোট ১৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করে। যা দেশটির জিডিপির ৫৩% এবং তা উদীয়মান যেকোনো বাজারের মধ্যে সর্বোচ্চ। অন্য দিকে, স্থানীয় ব্যাংকিং সেক্টরের ঋণও দ্রুত বেড়ে যায়। পূর্ববর্তী তিন বছরে এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৩% (নাজিম, ২০০৯)। ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত আরব আমিরাতের ব্যাংকিং খাতে মোট ক্রেডিট পোর্টফলিও মোটামুটি ২৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। যা ছিল জিডিপির ১০৮%। দুবাই ইনকরপোরেট সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য কোনো সরকারি সূত্র থেকে পাওয়া যায়নি। তবে বিশ্লেষকদের হিসাব মতে, দুবাই ও আবুধাবির ব্যাংকগুলো দুবাই ইনকরপোরেট এনটিটিগুলোকে মোট ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দেয়। এ ছাড়াও দুবাই সরকারকে ঋণ দেয় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দুবাই ইনকরপোরেট-এর ৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক ঋণ ও বন্ডসহ এই করপোরেশনগুলোর মোট ঋণ ছিল ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো (রেজগাল্লাহ, ২০০৯)।

স্থানীয় সম্পদ মূল্যে ধস নামার সঙ্গে সঙ্গে পুনঃঅর্থায়নের চাহিদা বেড়ে গেলে তা দুবাইয়ের ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুবাই সরকার ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বন্ড বাজারে ছাড়ে। এতে খেলাপি নিয়ে উদ্বেগ কিছুটা কমে। ইউএই সেন্ট্রাল ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে ১০ বিলিয়ন ডলারের বন্ড কিনে নেয়। দুবাই সরকার ছাড়া সেখানকার আর কোনো প্রতিষ্ঠান ২০০৯ সালে পাবলিক মার্কেট থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারেনি (নাজিম, ২০০৯)। তাই, ২০১০ সালে পরিপক্ব হওয়া বিনিয়োগ (ডেট) পরিশোধের জন্য দুবাই এনটিটিগুলোর সহায়তা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইউএইর রাজধানী আবুধাবি এ সময় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। পরিপক্ব হওয়া বিনিয়োগ পরিশোধে অর্থায়নের জন্য ২০০৯ সাল জুড়ে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি সহায়তা দেয় আবুধাবি। এরপরও দুবাই সরকারকে তীব্র আর্থিক টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সরকারি আয়ের বড় উৎস ছিল বিভিন্ন ধরনের ফি। এর মধ্যে রয়েছে জমি কেনাবেচা, মর্টগেজ রেজিস্ট্রেশন, ইমিগ্রেশন ও ট্যুরিজম ফি ইত্যাদি। চলমান অর্থনৈতিক মন্দা, বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট খাতে স্থবিরতা নেমে আসায় দুবাইয়ের আর্থিক অবস্থা বেশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।

২০০৬ ও ২০০৮ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক মার্কেট থেকে দুবাইয়ের বিনিয়োগ গ্রহণের প্রবণতা অনেক বেড়ে যায়। এর পরিমাণ ছিল ৭২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো, যা দুবাইয়ের ২০০৮ সালের জিডিপির ৮৮%। এই বিনিয়োগের ২৫.১% রিয়েল এস্টেট খাত এবং ২৬.৪% কংগ্লোমরেটগুলোর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ব্যয় করা হয়। এই বিনিয়োগ পরিপক্বতার গড় সময় সাড়ে চার বছর হলেও

তা রিয়েল এস্টেট খাতের মতো দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয় (রেজগাল্লাহ, ২০০৯)। ২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে দুবাই এনটিটিগুলোকে পূর্বের বিনিয়োগ পরিশোধ করতে হয়। এ থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে 'ডেট ইসুয়েন্স' প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পরিপক্ব বিনিয়োগ পরিশোধে সমস্যা দুবাইয়ের সঙ্কট কবলিত আর্থিক পরিস্থিতিকে আরো করুণ করে তোলে।

স্থবির দুবাই ওয়ার্ল্ড

নাখিল ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর ৫.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তিনটি 'ডেট ইসুয়েন্স' স্থবির হয়ে পড়ে (নাসদাক দুবাই, ২০০৯)। সংক্ষেপে এই ইস্যুগুলো হচ্ছে : বিশেষ কর্মসম্পাদনের জন্য বাজারে ছাড়া নাখিল ডেভলপমেন্ট লিমিটেড-এর সুকুক। এটা ছিল ইসলামী ব্যাংকিং-এর ইতিহাসে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় সুকুক ইস্যুর ঘটনা। এটা ইসলামী এবং প্রচলিত উভয় ধরনের পুঁজি বাজারের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রথম ইস্যু (ইসলাম ফিন্যান্স নিউজ, ২০০৬)। শরী'আহ্ বিধি মেনে এই 'সুকুক' গঠন করা হয় এবং দুবাই ইসলামিক ব্যাংক-এর শরী'আহ্ বোর্ড তা অনুমোদন করে। এই লেনদেন ছিল সুকুক-আল-ইজারার সঙ্গে যুক্ত তিন বছর মেয়াদি প্রি-কিউপিও (কোয়ালিফাইং পাবলিক অফারিং) ইকুইটি। একটি ক্রয়চুক্তির আওতায় পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট ধরনের সম্পদ নাখিল ডেভেলপমেন্ট লি.-এর কাছে বিক্রি করা হয়। এটা ছিল একটি অফশোর স্পেশাল পারপোজ ভেহিকেল (এসপিভি)। উল্লিখিত সম্পদের মধ্যে ছিল দুবাই সমুদ্র উপকূলে নির্দিষ্ট ভূমি, ভবন ও অন্যান্য সম্পদের ওপর ৫০ বছর মেয়াদি 'লিজহোল্ড রাইট'। ইসলামী পুঁজি বাজারে আগে কখনো এ ধরনের সুকুক গঠন করা হয়নি। প্রাথমিকভাবে ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সুকুক ছাড়ার পরিকল্পনা করা হলেও তা বিক্রি হয় আড়াই গুণেরও বেশি। শেষ পর্যন্ত ৩.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে ক্লোজ করা হয়। মেয়াদ শেষে কত মুনাফা পাওয়া যাবে কিউপিও ইল্ড (QPO yield)-এ তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। এটা নির্ভরশীল ছিল নাখিল-এর আয়ের ওপর। প্রচলিত বন্ডের সঙ্গে তুলনা করার জন্য 'কিউপিও ইল্ড' ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রতিযোগিতামূলক সুকুক-এর মূল্য নির্ধারণ করা যায়।

সুকুক	লিস্টিং ডেট	ম্যাচিউরিটি	পরিমাণ (মার্কিন ডলার)	ধরন	কিউপিও
নাখিল ডেভেলপমেন্ট লিঃ	১৪ ডিসেম্বর, ২০০৬	২০০৯	৩.৫২ বিলিয়ন	সুকুক আল ইজারা	৬.৩৪৫%
নাখিল ডেভেলপমেন্ট-২ লিঃ	১৭ জানুয়ারি, ২০০৮	২০১১	৭৫০ মিলিয়ন	সুকুক আল ইজারা	৫.৫%
নাখিল ডেভেলপমেন্ট-৩ লিঃ	১৪ মে, ২০০৮	২০১০	৯৮০ মিলিয়ন	সুকুক আল ইজারা	প্রযোজ্য নয়

সুকুক ও প্রচলিত পশ্চিমা ধাঁচের বন্ড

প্রথম নজরে সুকুক-কে প্রচলিত বন্ডের মতো কিছু মনে হবে। কারণ, এগুলো আধা বার্ষিক মুনাফা প্রদান করে। তবে, এ ধরনের ভূমিকেন্দ্রিক শরী'আহ্সম্মত সুকুক আল-ইজারার আধা বার্ষিক মুনাফাকে বিবেচনা করা হয় সম্পদ ইজারা দেয়ার ভাড়া হিসেবে। নাখিল কৌশলে এসপিভির মাধ্যমে ৩.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সুকুক সম্পদ বিক্রি করে। এখানে অঙ্গীকার করা হয় যে, তিন বছর পর নাখিল এই ৩.৫২ বিলিয়ন ডলারের সুকুক কিনে নেবে। এসপিভি উল্লিখিত সম্পদ নাখিলকে ইজারা দেবে এবং নাখিল ৬ মাস পর পর এসপিভি-কে সম্পদের 'ভাড়া' পরিশোধ করবে। এসপিভি এই আধাবার্ষিক ভাড়া সংগ্রহ করে তা সুকুক-মালিকদের মধ্যে বিতরণ করবে। মেয়াদ শেষে সুকুক-মালিকেরা এসপিভি কাছে তাদের সুকুকগুলো আসল দামে (face value) বিক্রি করে দেবে। খেলাপির কারণ ঘটলে, নাখিল দীর্ঘমেয়াদি ইজারা পুনরায় কিনে নেবে এবং বিলম্বিত 'ভাড়া' পরিশোধ করা হবে।

দুবাই ওয়ার্ল্ড-এ বিনিয়োগ স্থবির পরিস্থিতিতে ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স (আইবিএফ)-এর ভূমিকা অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রচলিত এবং ইসলামী বন্ডগুলোর মধ্যে পার্থক্যটি বুঝতে হবে। প্রচলিত ক্ষেত্রে যে বাণিজ্যিক বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বন্ড ছাড়া হয় এর মাধ্যমে বন্ডক্রেতা ওই প্রতিষ্ঠানের কোনো অংশের মালিকানা লাভ করেন না। এর বদলে বন্ড ইস্যুকারী আসলে বন্ডক্রেতার কাছ থেকে সুদের বিনিময়ে ঋণ নেয়। জিরো-কুপন বন্ড ছাড়া বন্ড ক্রেতাকে নিয়মিত সুদ পরিশোধ করতে হয়। সুদের হার নির্ধারিত কিংবা ভাসমান হতে পারে। কিন্তু এতে কখনোই প্রকৃত লাভের অংশের প্রতিফলন ঘটে না। মেয়াদ শেষে বন্ড-এর অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। তখন প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক না লোকসানি, তা দেখা হয় না। আবার বন্ড বিক্রেতা যত লাভই করুন না কেন তা পুরোপুরি তার।

সাধারণত 'সুকুক' বলতে রাজস্ব বা মুনাফা অর্জিত হয় এমন কোনো সম্পদে মালিকানার অংশ বোঝানো হয়, যেমন : লিজ দেয়া সম্পদ। কুপন (প্রচলিত বন্ড-এর সুদের হার)-এর সঙ্গে তুলনা করলে বেশিরভাগ সুকুক-কে প্রচলিত বন্ড-এর মতো মনে হবে। কারণ, এগুলো যে মুনাফা বিতরণ করে তা কিছুটা সুদ-এর হারের অনুরূপ। এই অনুশীলনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সুকুক ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ চুক্তিতে একটি অনুচ্ছেদ জুড়ে দেয়। তাতে বলা থাকে, প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত লাভ যদি সুদের হারের চেয়ে বেশি হয় তাহলে বাড়তি অর্থের পুরোটাই ইনসেনটিভ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পাবে প্রতিষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য (ওসমানি, ২০০৯)। প্রকৃত লাভ যদি উল্লিখিত শতকরা হারের চেয়ে কম হয় (prescribed per-centage), তাহলে এই পার্থক্যের (আসল মুনাফা ও ঘোষিত মুনাফা হারের মধ্যে) কতটুক 'সুকুক হোল্ডারদের' দেয়া হবে সে সিদ্ধান্ত নেবে ব্যবস্থাপনা। কারণ, সুকুককে বিবেচনা করা হয় সুদ-মুক্ত 'ঋণ' হিসেবে। তখন সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য মুনাফায় যে বাড়তি অংশ থাকে তা থেকে অথবা সুকুক পরিশোধকালে সম্পদ পুনঃক্রয় মূল্য কম দেখিয়ে এই ঋণ পরিশোধ করে ঋণগ্রহণকারী ব্যবস্থাপনা। আসলে বর্তমানে যেসব সুকুক ইস্যু করা হচ্ছে সেগুলোতে মেয়াদ শেষে সুকুক ক্রেতাকে মূল অর্থ (principal) ফেরত দানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এটা ঠিক প্রচলিত বন্ডের মতো। এখানে সুকুক ইস্যুকারী বা ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে একটি অবশ্য পালনীয় অঙ্গীকার থাকে যে, প্রক্রিয়ার শুরুতে ঘোষিত

সম্পদের যে মূল্যের জন্য ক্রেতা সুকুক কিনেছিলেন ওই মূল্যে তা কিনে নেয়া হবে। পরিপক্বতার পর সম্পদের বাজার মূল্য যাই হোক না কেন তা বিবেচনায় নেয়া হবে না (উসমানি, ২০০৯)। লক্ষণীয় বিষয় হলো এসব সুকুক-এর ক্ষেত্রে যাকে 'ইনসেনটিভ' বলা হচ্ছে তা সত্যিকার অর্থে কোনো ইনসেনটিভ নয়, তা আসলে মুনাফার হারের ভিত্তিতে 'সুকুক' বিপণনের একটি পদ্ধতি মাত্র। বিশ্বের যেখানেই কোনো বিনিয়োগকারী সুকুক কিনেন না কেন তার উচিত প্রচলিত বন্ডের সঙ্গে এর তুলনা করে দেখা। সুনির্দিষ্ট হারে মুনাফা দেয় বলে প্রচলিত বন্ডগুলো বাজারে ভালোভাবে মূল্যায়িত হয়।

২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে দুবাই ওয়ার্ল্ড ঘোষণা করে যে তারা ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ 'রিশিডিউলিং' প্রক্রিয়া শুরু করছে। দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মেদ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করেন যে দুবাই 'ঋণ পরিশোধে'র ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এমনটা ভেবে 'উদ্বিগ্ন' হওয়ার কারণ নেই (আল মাকতুম, ২০০৯ ক,খ)। ২০০৯ সালের অক্টোবরে দুবাই ওয়ার্ল্ড ঘোষণা করে, পুনর্গঠনের আসল কাজ প্রায় শেষের পথে এবং তারা পরবর্তী তিন বছরে ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাশ্রয় করতে সক্ষম হবে। তারা বিশ্বব্যাপী তাদের জনশক্তির ১৫% ছাটাই করে। এরপর, ২৫ নভেম্বর দুবাই সরকার ঘোষণা করে, তারা আবুধাবি সরকার পরিচালিত দুটি ব্যাংক - ন্যাশনাল ব্যাংক অব আবুধাবি ও আল-হিলাল ব্যাংক থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার তুলতে সক্ষম হয়েছে। এটা দুবাই সরকারের ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বন্ড বিক্রির দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাই অংশ। এর কয়েক ঘন্টা বাদেই দুবাই সরকার ফের ঘোষণা করে, দুবাই ওয়ার্ল্ডের আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য একে পুনর্গঠন করা হবে। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দুবাই ওয়ার্ল্ড তার ঋণদাতাদের এবং 'এনটিটি' নাখিলকে ঋণ পরিপক্বতার সময়সীমা অন্তত ২০১০ সালের ৩০ মে পর্যন্ত বাড়ানোর আহ্বান জানায়। সরকার আরো স্পষ্ট করে দেয় যে, এর আগে যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তোলার কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে এই পুনর্গঠনের কোনো সম্পর্ক নেই।

পরদিন, ২৬ নভেম্বর সুপ্রিম ফিসক্যাল কমিটি (এসএফসি) অফ দুবাই-এর চেয়ারম্যান শেখ আহমেদ বিন সাঈদ আল মাকতুম এক বিবৃতিতে বলেন, খুবই সতর্ক পরিকল্পনার সঙ্গে দুবাই ওয়ার্ল্ড পুনর্গঠনের কাজ চলছে এবং দুবাই ওয়ার্ল্ডের ঋণের বোঝা লাঘবের জন্য কিছু চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এর দু'দিন বাদে দুবাই সেন্ট্রাল ব্যাংক ঘোষণা করে যে, এটি বিদেশী ব্যাংকের স্থানীয় শাখাগুলোকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত এবং স্থানীয় ব্যাংকগুলোকে সহায়তার জন্য একটি বিশেষ 'তারল্য সুবিধা' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে (নাজিম, ২০০৯)। ১৪ ডিসেম্বর দুবাই সরকারের পক্ষে এসএফসির চেয়ারম্যান আরেকটি বিবৃতি দেন। এতে তিনি দুবাই ওয়ার্ল্ডের ব্যাপারে নেয়া বেশ কিছু কর্মসূচির বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, বিনিয়োগ স্থবিরতা শুরুর পর থেকেই দুবাই সরকার ইউএই-র অর্থনীতি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থার ওপর দুবাই ওয়ার্ল্ডের প্রভাব খতিয়ে দেখতে আবুধাবি সরকার ও ইউএই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান তার বিবৃতিতে দুবাই ওয়ার্ল্ডের সহায়তায় একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তুলে ধরেন। আবুধাবি সরকার দুবাই ফিন্যান্সিয়াল সাপোর্ট ফান্ড (ডিএফএসএফ) গঠন করে এবং দুবাই ওয়ার্ল্ডের আসন্ন

ঋণদায় সামাল দিতে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল গঠন করতে রাজি হয়। এর প্রথম ধাপ হিসেবে ১৪ ডিসেম্বর যেসব সুকুক পরিপক্বতা লাভ করে সেগুলোর দায় পরিশোধের জন্য দুবাই সরকার ৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেয়। বাকি ৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাখা হয় ২০১০ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত 'মুনাফা' ব্যয় এবং 'চলতি মূলধন' ব্যয় মেটানোর জন্য। চেয়ারম্যান তার সমাপনী ভাষণে দু'বার উল্লেখ করেন যে, 'সকল স্টেকহোল্ডারের স্বার্থ সর্বোত্তমভাবে রক্ষার জন্য'ই তার এসব উদ্যোগ (আল মাকতুম, ২০০৯ ক,খ)।

স্থবিরতার স্বল্পমেয়াদি প্রভাব

দুবাই ওয়ার্ল্ডের এই বিনিয়োগ স্থবিরতার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় বিশ্বের অর্থায়ন বাজারে। ডেট ক্যাপিটাল মার্কেট, বিশেষ করে আইবিএফ-এর ওপর এর স্থায়ী প্রভাব পড়ে। এই ঘটনার পরের মাসগুলোতে বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন ছিল নাখিল ও দুবাই ওয়ার্ল্ড কিভাবে তাদের দেনা পরিশোধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে তা দেখতে। বন্ডের কোনো ছাড় দেয়া হয় কি না বা আবুধাবি এগিয়ে আসে কি না। এই ঘটনার কয়েক মাস পর ২০১০ সালের ২৫ মার্চ দুবাই ওয়ার্ল্ড এবং নাখিল তাদের দায় পুনর্গঠনের প্রস্তাব দেয়। এক সংবাদ সম্মেলনে এই পরিকল্পনা তুলে ধরেন এসএফসির চেয়ারম্যান। নাখিল-এর ব্যাপকভিত্তিক 'রিক্যাপিটালাইজেশন' পরিকল্পনায় বিনিয়োগকারীদের শতভাগ 'এগ্রিড অ্যামাউন্ট ওউড' (100% of agreed amounts owed) প্রস্তাব দেয়া হয় এবং নিকট ভবিষ্যতে যেসব প্রকল্পের কাজ শেষ হবে সেগুলো থেকে দায় পরিশোধ করা হবে বলে গ্রাহকদের আশ্বস্ত করা হয়। 'রিক্যাপিটালাইজেশন' পরিকল্পনার আওতায় দুবাই সরকার ডিএফএসএফ-এর মাধ্যমে সরাসরি নাখিলকে নতুন করে প্রায় ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জোগান দেয়ার অঙ্গীকার করে, যাতে নাখিল তার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এবং দায়-দেনাগুলো পরিশোধ করতে পারে। এছাড়াও, নাখিল-এর বিদ্যমান ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ ইকুইটিতে পরিবর্তন আনার প্রস্তাব দেয় 'ডিএফএসএফ'। তবে, বিনিয়োগকারীরা পরিকল্পনা মেনে নিলেই কেবল দুবাই সরকার এতে সহায়তা দেবে বলে ঘোষণা করে। যা হোক, চুক্তির শুরুতে কাছাকাছি সময়ে শেষ হবে এমন প্রকল্পগুলোর কাজ এগিয়ে নিতে 'ডিএফএসএফ' থেকে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল লাভ করে নাখিল।

দুবাই ওয়ার্ল্ড তার সব বিনিয়োগকারীর কাছে একটি পুনঃঅর্থায়ন (recapitalize) প্রস্তাব পাঠায়। এতে বলা হয়, ডিএফএসএফ-এর মাধ্যমে দুবাই সরকার ৮.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ এবং দাবি ইকুইটিতে রূপান্তর করবে, যা এককভাবে কোম্পানির ঋণ ও গ্যারান্টির ৩৮% । এছাড়া কোম্পানির 'চলতি মূলধন' এবং নতুন বিনিয়োগসুবিধা থেকে সৃষ্ট মুনাফা পরিশোধের জন্য 'ডিএফএসএফ' দুবাই ওয়ার্ল্ডকে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত দেয়ার অঙ্গীকার করে। প্রস্তাবে বলা হয়, নতুন 'ডেট ইস্যুয়েন্স'-এর মাধ্যমে ডিএফএসএফ-এর বাইরে থাকা ঋণদাতারা তাদের ১০০% আসল ফেরত পাবেন। এসব ইস্যু ৫ ও ৮ বছরে পরিপক্বতা লাভ করবে। বিনিয়োগকারীদের কাছে সবকিছু স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে এই দুটি ঘোষণা ছিল ইতিবাচক। এরপরও এই পরিকল্পনা বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি কমে আসার

নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয় । এর মানে হলো, আসল ফেরত পাওয়ার জন্য দুবাই ওয়ার্ল্ডে বিনিয়োগকারীদের নির্ভর করতে হবে সম্পদ বিক্রি এবং ডিভিডেন্ট-এর ওপর ।

স্থবিরতার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এবং আইবিএফ'র ভূমিকা

যদিও দুবাই ওয়ার্ল্ডের ঋণ স্থবিরতার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল মূল্যায়ন করার সময় এখনো হয়নি কিন্তু এ ক্ষেত্রে আইবিএফ'র ভূমিকা যাচাই করা সম্ভব । ২০০৬ সালের জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কোম্পানি হিসেবে 'ইস্ট ক্যামেরন পার্টনার্স এলপি' সুকুক ইস্যু করে । এই কোম্পানি শেষ পর্যন্ত খেলাপি হয় এবং ২০০৮ সালের অক্টোবরে একে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় । এ নিয়ে মামলা এখনো আদালতে বিচারাধীন । লুজিয়ানার দেউলিয়া আদালতের বিচারক সুকুক ক্রেতাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন, অর্থাৎ তারা কোম্পানির তেল ও গ্যাসের কোনো অংশের মালিকানা পাবেন কি না সে বিষয়ে রায় দেবেন । যুক্তরাষ্ট্রের গতানুগতিক একজন বিনিয়োগকারী চান আদালত যেন সুকুক-কে ইকুইটি নয়, ঋণ হিসেবে বিবেচনা করে । এমনকি তা শরী'আহ্ বিধানের পরিপন্থী হলেও । কারণ, আদালত যদি তা ঋণ হিসেবে রায় দেয় তাহলে ঋণদাতারা ইকুইটি মালিকদের চেয়ে আগে অর্থ ফেরত পাবেন ।

যদিও এখনো দুবাই ওয়ার্ল্ডকে দেউলিয়া ঘোষণার মতো কারণ ঘটেনি কিন্তু সুকুক কি ঋণ, নাকি ইকুইটি - এই বিতর্ক রয়ে গেছে । সুকুক-এর মৌলিক নীতি যদি হয় লাভ-লোকসান ভাগাভাগি, তাহলে যে কারো মনে হবে এটি ঋণের চেয়ে ইকুইটি'র কাছাকাছি । মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 'ঋণ স্থবিরতা' যদি সঠিক পরিভাষা হয় তাহলে দুবাই ওয়ার্ল্ডের ঘটনা নাখিল-এর সুকুক আল-ইজারা নিয়ে আরো বিশ্লেষণ প্রয়োজন ।

প্রায়ই বলা হয় যে, সুকুক প্রচলিত অর্থায়নব্যবস্থার সম্পদভিত্তিক সিকিউরিটির (এবিএস) অনুরূপ, যেখানে ইস্যুকারী কোম্পানির স্থিতিপত্রে উল্লেখ করা প্রকৃত সম্পদের মালিকানা দেয়া হয় বিনিয়োগকারীদের । আল-ইজারা কাঠামোর আওতায় দুবাই ওয়ার্ল্ডের সুকুক বাজারে ছাড়া হয় । যা এবিএস-এর অনুরূপ । প্রচলিত অর্থায়নে সম্পদ (ক্রেডিট কার্ড লোন, অটোলোন) বা মর্টগেজগুলো একত্র করে একটি এসপিভিতে রাখা হয় । এবিএস মূল-এর ওপর দাবি পুল-এ দেয়া লোন-এর জন্য মুনাফার প্রতিনিধিত্ব করে 'সিকিউরিটি' গঠনের মাধ্যমে । এখানে সিকিউরিটিগুলো বিক্রি করা হয় মূলত বন্ড হিসেবে । এবিএস-এর নতুন ইস্যুগুলো ইউএস ট্রেজারি সিকিউরিটির চেয়ে উচ্চতর মুনাফা দিয়ে থাকে । একই ধরনের পরিপক্বতা ও ক্রেডিট কোয়ালিটি সম্পন্ন অনেক কর্পোরেট বন্ড-এর মুনাফা বেশি । কারণ, বিনিয়োগকারীরা 'প্রি-পেমেন্ট রিস্ক'-এর জন্য উচ্চতর হারে সুদ প্রত্যাশা করে । এতে কোনো এবিএস'র গড় জীবনকাল কী হবে তাতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় ।

শরী'আহ্ বিধান অনুযায়ী সুকুক অবশ্যই প্রকৃত সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে । সুকুক আল-ইজারায় যে এসপিভি সুকুক ইস্যু করে, তার কাছে অন্তর্নিহিত সম্পদ বিক্রি করা হয় । এরপর এই এসপিভি ওই সম্পদ কোম্পানির কাছে ভাড়া দেয় । কোম্পানি সুকুকধারীদের 'ভাড়া' পরিশোধ করে । নাখিল-এর সুকুক চুক্তিগুলোতে বলা হয় যে, সুকুক পরিপক্ক হওয়ার পর ইস্যুকারী অন্তর্নিহিত সম্পদ

পুরো মূল্যে কিনে নেবে। ঠিক এ কারণেই দুবাই একটি 'স্থবিরতায়' পড়তে বাধ্য হয়েছিল। ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর সুকুক পরিপক্ব হওয়ার পর নাখিল ডেভলপমেন্ট লিমিটেড সেগুলো পরিশোধ করতে অসমর্থ ছিল। এর পরিবর্তে তারা বিনিয়োগকারীদের প্রতি অনুরোধ জানায়, তারা যেন অর্থ তুলে নেয়া ৬ মাস পিছিয়ে দেয়। দুবাই ওয়ার্ল্ড ভেবেছিল এ সময়ের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের পুরো অর্থ ফেরত দেয়ার মতো পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহ সম্ভব হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ঘটনাটি এমন ছিল না। সেখানে এবিএস এবং এমবিএস মালিকদের অনেকে তাদের প্রাথমিক বিনিয়োগের মাত্র সামান্য একটি অংশ ফেরত পেয়েছিল।

ফেডারেল রিজার্ভ এসব 'সিকিউরিটাইজড প্রডাক্ট' কিনে নিতে তহবিল জোগানোর পরও বিশ্বজুড়ে বহু বিনিয়োগকারী প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দুবাই ওয়ার্ল্ড ও নাখিল-এ বিনিয়োগকারীরা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখলে হয়তো এ মাত্রার ক্ষতির সম্মুখীন হবেন না। তারা যদি মাধ্যমিক বাজারে সুকুক বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। ইস্যুর শুরুতে নাখিলের সুকুক ডলারের ১১০%-এর ভিত্তিতে কেনা হয়। স্থবিরতা ঘোষণার পর এগুলো কেনাবেচা হয় ডলারের ৬০%-এর ভিত্তিতে (ব্রায়ান-লো, ২০০৯)। যাহোক, বিনিয়োগকারীরা স্বল্পমেয়াদে তাদের আসল অর্থের পুরোটা ফিরে পাবেন কি না তা জানা না গেলেও সুকুক-এর চুক্তি অনুযায়ী কোনো এক সময় তারা পুরো বিনিয়োগ ফেরত পাবেন, এমনটা ধরে নেয়া যায়।

বিনিয়োগকারী ও বিনিয়োগগ্রহীতা নাখিল ও দুবাইর পুনঃঅর্থায়ন পরিকল্পনা মেনে নিয়েছেন। তবে এই উভয়সঙ্কট আদালত পর্যন্ত গড়ালে কী ঘটতে পারত তা ভেবে আমরা বিস্মিত হই।

হয়তো ইসলামী আইনে সুকুক বিনিয়োগকারীদের আসল সুরক্ষার বৈধতা প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে। আবার সুকুক ইস্যুকালে সম্পদের আসল মূল্য পুনঃপরিশোধের অনুমতি দিতে পারেন বিশেষজ্ঞরা। শরী'আহ্ বিধান অনুযায়ী, সাধারণভাবে ইস্যুকারীরা স্থিরমূল্যে অন্তর্নিহিত সম্পদ পুনরায় কিনে নেয়ার মাধ্যমে আসল-এর গ্যারান্টি বা কোনো বিনিয়োগ গ্যারান্টি দিতে পারে না। যেকোনো পুনঃক্রয় হতে পারে কেবল নিট মূল্যে বা ন্যায্য বাজার মূল্যে। নাখিল-এর লেনদেন যেহেতু বাণিজ্যিকভাবে লিজ নেয়া সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই সুকুক আল-ইজারার ব্যাপারে বর্তমান এএওআইএফআই-এর সুপারিশসংশ্লিষ্ট আইনি ব্যবস্থায় সম্পদের প্রকৃত মূল্য বা বাকি লিজ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ পর্যন্ত পুনঃপরিশোধের অনুমতি দেয়া হতে পারে। এর মধ্য দিয়ে সুদ পরিহারের বিষয়টি কার্যকর হবে।

শরী'আহ্ আইনে সময়সাপেক্ষ লাভ-লোকসান ভাগাভাগি ব্যবস্থায় ভাতা দাবি করে। এই আসল সরাসরি মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কিত চুক্তিগত নিশ্চয়তার সঙ্গে যুক্ত। তবে, নাখিল সুকুক-এর মূল শর্তাবলি সম্পদের সঙ্গে এ ধরনের প্রত্যক্ষ সংযোগ বাতিল করে দেয়। সুকুক-এ বিনিয়োগকারীদের দাবি কেবল সম্পদভিত্তিক হিসেবে বিবেচিত, নিশ্চিত সম্পদভিত্তিক নয়। বিনিয়োগকারীদের মালিকানা কেবল নগদ অর্থ লেনদেনের সঙ্গে সম্পর্কিত, সম্পদ লেনদেনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। রিস্ক/রিটার্ন প্রোফাইল-এর ক্ষেত্রে সম্পদভিত্তিক সুকুক যৌক্তিকভাবে ইকুইটি অবস্থানের কাছাকাছি। কারণ, সুকুকধারীরা অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকানা ধারণ করেন এবং পরিশোধে ঘাটতির ঘটনা ঘটলে প্রবর্তকের কাছে আসল মূল্য দাবি করার কোনো সুযোগ নেই।

অন্য দিকে, নাখিল-এর সুকুক আল-ইজারা'র মতো সম্পদভিত্তিক সুকুক হলো 'ঋণ' এর কাছাকাছি। কারণ, পরিশোধে ঘাটতি হলে সুকুকধারীরা সুকুক-সৃষ্টিকারীদের (originator) কাছে যেতে পারেন। আসল মূল্যে কিনে নেয়া হবে এমন চুক্তিতে ইজারা সুকুক অন্তর্নিহিত সম্পদ থেকে একটি ভাড়ামূলক আয় সৃষ্টি করে। তাই, নাখিল-এর চুক্তিতে একটি পুনঃক্রয় ধারা যুক্ত ছিল। এতে বলা হয়, খেলাপির ঘটনা ঘটলে ইস্যুকারী ওই সম্পদ আসল মূল্যে কিনে নেবে। এর ফলে ব্যবস্থাটি 'ঋণ'-এ পরিণত হয়েছে। সুকুক-ক্রেতাদের সম্পদে দখল নেয়ার সুযোগ নেই; তাদের দাবিগুলো ইস্যুকারীর ওপর 'ঋণদায়' হিসেবে পরিবর্তিত হয়েছে, যা অনিশ্চিত। তাই, সুকুকধারীরা যদি তাদের অবস্থান বজায় রাখেন তাহলে তাদের বিনিয়োগ পুরোপুরি ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, দুবাই ওয়ার্ল্ডে বিনিয়োগ স্থবিরতা ছিল একটি সুকুক আল-ইজারা। যা আইবিএফ'র একটি 'ডেট ইন্সট্রুমেন্ট'। এখানে বিনিয়োগকারীরাও অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন। প্রচলিত বন্ড বা এবিএস-এর ক্ষেত্রে খেলাপির ঘটনা ঘটলে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা সুকুকধারীদের তুলনায় কম।

নজিরবিহীন

এ বিষয়ে আগের কোনো নজির না থাকায় এখানে যে বিশ্লেষণটি করা হয়েছে তা মূলত প্রকল্পধর্মী (hypothetical)। ২০০৯ সালে ইনভেস্টমেন্ট দার কোম্পানির কুয়েতি মালিক এস্টোন মার্টিন লাগোন্ডা লিমিটেড-এর ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। এটা ছিল উপসাগরীয় অঞ্চলের কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে ইসলামিক বন্ড খেলাপির প্রথম ঘটনা। ২০০৯ সালের জুনে সৌদি আরবভিত্তিক একটি পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশ 'সাদ গ্রুপ' ৬৫০ মিলিয়ন ডলারের সুকুক বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফা পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়লে তা পুনর্গঠন শুরু হয়। ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীরা সাদ গ্রুপ এবং এর সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি পাওনা ছিল। এসময় বিনিয়োগকারীরা সাদ গ্রুপের বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্ক, কেম্যান আইল্যান্ড এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন আদালতে মামলা করে। এসব প্রতিষ্ঠান এবং ইস্ট ক্যামেরন অংশীদারের মধ্যে মামলার কার্যক্রম এখনো চলছে। তাই, দুবাই ওয়ার্ল্ডের বিনিয়োগ স্থবিরতার ফল শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।

সরকারি মালিকানাধীন এবং দুবাই ওয়ার্ল্ড ও নাখিলের মতো বৃহৎ কোনো প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের ইতিহাস সংযুক্ত আরব আমিরাতে নেই। তাই এই অঞ্চলে ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের 'রোডম্যাপ'টি বোঝার জন্য বিনিয়োগকারীরা নাখিল বন্ডসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির ওপর নজর রাখবেন। প্রচলিত বন্ডের ক্ষেত্রে যেখানে অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেখানে আদালত এক্ষেত্রে কিভাবে ন্যায়বিচার করেন তা দেখার বিষয়। দুবাই ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে আবুধাবি যে 'বেইলআউট' কর্মসূচি গ্রহণ করে তাতে সরাসরি কোনো প্রশ্ন তোলার সুযোগ কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া শরী'আহ্সম্মত হওয়া এবং শরী'আহ্ বিধির একনিষ্ঠ অনুসরণের বিষয়টিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সুকুক-এর উন্নয়ন এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। এ বাস্তবতা ধরে নিলে বলা যায় সুকুক-এর বিকাশ অব্যাহত থাকবে।

আরেকভাবে বিচার করলে, দুবাই ওয়ার্ল্ডের ঘটনা কোনো 'রিয়েল এসেস্ট সাইকেল'-এর শেষপর্যায়ে যা ঘটে তার একটি সাধারণ উদাহরণ। অর্থনীতিবিদ হেম্যান মিনস্কি একে 'পঞ্জি ফিন্যান্স' (এক ধরনের প্রতারণামূলক বিনিয়োগ প্রকল্প, যেখানে বিনিয়োগকারীদের ন্যূনতম ঝুঁকির বিনিময়ে উচ্চতর মুনাফার লোভ দেখানো হয়) হিসেবে অভিহিত করেছেন (মিনস্কি, ১৯৮২)। 'পঞ্জি ফিন্যান্স'-এর ক্ষেত্রে চলতি ঋণ পরিশোধ মেটানোর জন্য নগদ অর্থপ্রবাহ পর্যাপ্ত হয় না। এমনকি প্রত্যাশিত আয় ভবিষ্যৎ পরিশোধের প্রয়োজনও মেটাতে পারে না। তাই মুনাফা বা আসল যেকোনো পরিশোধের ক্ষেত্রেই কোম্পানির ঘাটতি থাকে। তখন মুনাফার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ধার-এর ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। দুবাই ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দুবাই বাজারে রিয়েল এস্টেট খাতে বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটন খাতের আয়েও ধস শুরু হয়। এতে দুবাই ওয়ার্ল্ডের আয় মারাত্মকভাবে কমে যায়। তারা তাদের ঋণদায় (debt obligation) পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং স্থবিরতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। দুবাই ওয়ার্ল্ডের সৌভাগ্য হলো তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে দুবাই সরকার ও আবুধাবি সরকার। এমন সরকারি সহায়তা না পেলে দুবাই ওয়ার্ল্ডের ঋণস্থবিরতা ওই অঞ্চলের জন্য আরো বড় ধরনের বিপর্যয়ের কারণ হতে পারত।

উপসংহার

অধিকসংখ্যক নাগরিক যেন সাব-প্রাইম মর্টগেজ ব্যবহার করে বাড়ি কিনতে পারেন সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঋণ নেয়ার শর্তাবলি শিথিল করলে পশ্চিমা বিশ্বের আর্থিক সঙ্কট তীব্র হয়। শেষ পর্যন্ত এসব মর্টগেজ প্যাকেজে পরিণত করে সিকিউরিটিগুলোকে 'ব্যাক' করার কাজে ব্যবহৃত হয়, যা বর্ধিত পরিশোধ থেকে মূল্য আয় করবে। যখন 'অ্যাডজাস্টেবল রেট মর্টগেজ'-এর মালিকরা বড় ধরনের বাড়তি পরিশোধের সম্মুখীন হন এবং মর্টগেজ জামানত হিসেবে দেখানো বাড়িগুলো মূল্য হারাতে শুরু করে তখন খেলাপি বেড়ে যায়। ঋণদাতারা বাড়িগুলো অধিগ্রহণ শুরু করলে 'মর্টগেজ ব্যাকড সিকিউরিটি'গুলো বেশিরভাগ মূল্য হারায়। এতে একটি 'চেইন-রিঅ্যাকশন' শুরু হয় এবং ঋণবাজারকে সঙ্কুচিত করে ফেলে যা শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মন্দা সৃষ্টি করে। আর বিনিয়োগকারীরা বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

ইসলামী ব্যাংকিং অনুসরণ করে এমন দেশগুলোকে ওই আর্থিক সঙ্কটের আঁচ তেমন পোহাতে হয়নি। এখানকার বিনিয়োগকারীদের পশ্চিমা দেশগুলোর মতো তেমন কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি। এমন কি 'স্থবিরতা' (পশ্চিমা ধারণায় খেলাপি'র মতো)-র ঘটনা ঘটলেও বিনিয়োগকারীদের পুঁজির কোনো অংশ হারানোর আশঙ্কা তেমন থাকে না।

আমাদের মূল্যায়ন হলো ইসলামিক ব্যাংকিং বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি সর্বনিম্নপর্যায়ে নিয়ে আসে । তাই, তাদের কখনো লোকসানের সম্মুখীন হতে হয় না । অন্যদিকে পশ্চিমা ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে লোকসান হতে পারে, এতে ঝুঁকি আরো বেড়ে যায় । তবে, এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই ।

অনুবাদ : হুমায়ুন কবির খানা

তথ্যসূত্র

আল মাকতুম, এস.বি.এস (২০০৯এ) । বিবৃতি, ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৯ ।

আল মাকতুম, এস.বি.এস (২০০৯বি) । বিবৃতি, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ ।

বারনানকি, বি. (২০০৭) । ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব শিকাগোর ৪৩তম বার্ষিক সম্মেলনে ব্যাংককাঠামো ও প্রতিযোগিতা বিষয়ে বক্তৃতা, বোর্ড অব গভরনর্স অব ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম, শিকাগো, ইলিনয়, ১৭ মে ২০০৭ ।

ব্রায়ান-ল, সি. (২০০৯), *'Dubai restructuring poses questions',* ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ৩ ডিসেম্বর ২০০৯ ।

মিনস্কি, এইচ.পি. (১৯৮২) । *'Can 'It' Happen Again? Essays on Instability and Finance', Finance and Profits: The Changing Nature of American Business Cycles, M.E. Sharpe.*

নাজিম, জেড. (২০০৯) । *'Cutting through the haze: further thoughts on Dubai Inc.', Emerging Markets Credit Research,* জে.পি. মর্গান, ২০ নভেম্বর ২০০৯ ।

নিসার, এস. (২০১০) । *'Islamic bonds (sukuk): its intro-duction and application', Finance in Islam: Learning Islamic Finance, Online: http://www. financeislam. com/article/8/1/546, Accessed 24/04/10.*

পোলার্ড, জে. এবং সামার্স, এম. (২০০৭) । *'Islamic banking and finance: postcolonial political economy and the decentring or economic geography',* রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি ও ইন্সটিটিউট অব বৃটিশ জিওগ্রাফার্স ।

রেজগাল্লাহ, বি. (২০০৯) । *'Dubai World restricting to test UAE banking system',* ইকনমিক রিসার্চ গ্লোবাল ডাটা ওয়াচ, জে.পি. মর্গান, ৪ ডিসেম্বর ২০০৯ ।

স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুরস (২০০৮) । *National Trend of Home Price Declines Continues Through the Third Quarter of 2008 According to the S&P/ Case-Shiller Home Price Indices,* ২৫ নভেম্বর ২০০৮, নিউ ইয়র্ক ।

দি ইকনমিস্ট (২০০৮) । সিএসআই: ক্রেডিট ক্রাঞ্চ, ১৮ অক্টোবর ২০০৮ ।

উসমানি, এম.টি. (২০০৯) । এএওআইএফআই শরী'আহ্ কাউন্সিল সভাপতি, সুকুক এবং তার সমসাময়িক প্রয়োগ ।

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুট (২০০৯) । সঙ্কট ও পুনরুদ্ধার, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, এপ্রিল ।